জওহরলাল নেহরু

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৩১ ডিসেম্বর ১৯৫১
কলিকাতা

জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী ; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্‌স্‌-এর সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেন নি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেন নি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

১৩৪৩

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যক্তিরূপ

ব্যক্তিরূপ-বিকাশের ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক আর কিছু আছে কিনা জানি না। এমন কি, ব্যক্তিরূপের বিকাশই যে শেষ বিচারে মনুষ্যত্বের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ এমন বলিলেও অন্যায় হইবে না। মানুষ যে কাজ করে তাহাকে ব্যক্তিরূপের বাস্তব ফল বলা যাইতে পারে; ব্যক্তিরূপ যদি বৃক্ষ, কর্ম তবে ফল। বৃক্ষের প্রকৃতির উপরেই ফলের প্রকৃতির নির্ভর। ইতিহাসের আলোচনায় কর্মরূপ ফল মুখ্য, সাহিত্যের আলোচনায় কর্মফল পরিত্যক্ত, কিংবা কর্মফল দৃষ্টান্তরূপে মাত্র গ্রাহ্য। আর যেহেতু জীবনচরিত-লেখক সাহিত্যের পঙক্তিভুক্ত, সেইজন্য তাহাকে ব্যক্তিরূপ বিকাশের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়।

ব্যক্তিরূপ ব্যক্তি ও জাতি দুয়েরই হইতে পারে। একটা জাতির অন্তর্নিহিত সাধারণতম লক্ষণগুলি দ্বারাই তাহার ব্যক্তিরূপ গড়িয়া ওঠে। বিদেশে একজন ভারতীয়কে দেখিলেই চোখে পড়ে, স্বদেশে তাহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাই না। বিদেশী পোশাক সত্ত্বেও তাহাকে ভারতীয় বলিয়া বুঝিতে বাধা হয় না, বিদেশী ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তাহাকে ভারতীয় বলিয়া বুঝিতে বাধা হয় না, কারণ নিজের অজ্ঞাত-সারে ভারতীয় জাতিগত ব্যক্তিরূপের সে বাহন, সে ব্যক্তিরূপটি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান।

একটি বিশেষ মানুষ একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যক্তিরূপ আর জাতিগত ব্যক্তিরূপকে বহন করিতেছে। দুয়ে প্রভেদ আছে, আবার

মিলও আছে। অসংখ্য ব্যক্তিগত ব্যক্তিরূপ সমষ্টিগত জাতিরূপকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে। ব্যক্তি একদিকে বিশিষ্ট, আবার সামগ্রিকভাবে, জাতিগতভাবে সে নির্বিশেষ। কিন্তু মোটের উপরে দুয়ে অসংগতি নাই।

ব্যক্তির কর্মকে ব্যক্তিরূপের বাস্তব ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ইতিহাস সেই কর্মফলের আলোচনা করে বলিয়া ইতিহাসের মর্যাদা সাহিত্যের চেয়ে নীচুতে। কর্মে ও মানুষে সব সময়ে সংগতি থাকে না; মানুষের সমস্ত কর্মের পুঞ্জীভূত রূপ আর তাহার ব্যক্তিরূপ সব সময়ে এক বস্তু নয়। তাহার ব্যক্তিরূপ তাহার পুঞ্জীভূত কর্মফলের চেয়ে অনেক সময়েই গুরুতর, সর্বদাই অনেক বেশি মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক। কর্মফল যেমন দৃষ্টিপ্রত্যক্ষ, ব্যক্তিরূপ তেমন নয়। তাই ব্যক্তিরূপের উপলব্ধির জন্য বিচারের ও বিশ্লেষণের দরকার হয়। কর্মফল সব সময়ে মানুষের ব্যক্তিরূপের সমর্থক নয় বলিয়াই কর্মের দ্বারা মানুষকে সব সময়ে বোঝা যায় না। ব্যক্তিরূপের বিচারই ব্যক্তিকে বুঝিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা। জাতিরূপের বিচারই জাতিকে বুঝিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা। কর্মরূপ ফলভারে পীড়িত ইতিহাস পড়িয়া সেইজন্য একটা মানুষকে ও একটা জাতিকে সব সময়ে বোঝা যায় না—অনেক সময়েই ভুল বুঝিতে হয়।

ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের কর্মগত ইতিহাস পড়িয়া এ দেশকে বুঝিবার সম্ভাবনা খুব অধিক নয়। আবার এ দেশের মহাপুরুষদের কর্মের অনুধাবন করিলেও এ দেশকে সম্পূর্ণ বুঝিব্যর সম্ভাবনা নাই। এ দেশকে বুঝিবার প্রকৃষ্টতম উপায়, এ দেশের মহাপুরুষদের ও মনীষী পুরুষদের ব্যক্তিত্বের বিচার।

আধুনিক কালে তিনজন ভারতীয় বাহিরে দেশের পরিচয় বহন

করিয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ; নেহরুকে চতুর্থ ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশের ধারণা প্রধানতঃ ইঁহাদের অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইঁহারাই বহির্জগতে ভারতের জাতিগত রূপের প্রতীক।

তবু এই চারজনের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ অল্প নয়। আবার চারজনে পৃথক্‌শ্রেণীভুক্ত হইয়াও দুইটি শ্রেণীতে পড়েন ; গান্ধী ও বিবেকানন্দ এক শ্রেণী, রবীন্দ্রনাথ ও নেহরু অপর শ্রেণী। কিন্তু দুই শ্রেণীতে কতকগুলি 'সামান্য' লক্ষণ আছে—বিদেশীর দৃষ্টিতে সেই সামান্য লক্ষণগুলিই ভারতীয়তাবাদ।

নেহরুর জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা ঐ কর্মফলের স্তূপ রচনা মাত্র। তাঁহার যথার্থজীবনী-লেখককে দেখাইতে হইবে পূর্বোক্ত তিনজনের সঙ্গে কোথায় তাঁহার মিল আর কোন্‌খানেই বা প্রভেদ, দেখাইতে হইবে ত্রিশ বৎসরকাল গান্ধীজির নিকটতম সহচররূপে থাকিয়াও কেন তিনি গান্ধীজির শ্রেণীতে না পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীভুক্ত হইলেন, দেখাইতে হইবে তাঁহার ব্যক্তিত্বে অপর তিনজনের সমান লক্ষণ কি কি বর্তমান, দেখাইতে হইবে কোন্ সামান্য লক্ষণের বলে বহির্জগতের চোখে তিনি ভারতবর্ষের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। এসব দেখানোর অপর নাম, নেহরুর ব্যক্তিরূপ-বিকাশের ইতিহাস রচনা। সে ইতিহাস রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তি-নেহরুর চেয়ে, কর্মী-নেহরুর চেয়ে, রাজনীতিক নেহরুর চেয়ে নেহরুর ব্যক্তিত্ব অনেক মহৎ—অনেক চিত্তাকর্ষক তো বটেই। নেহরু যদি রাজনীতিক না হইতেন, তবে তাঁহাকে আরও বেশি জানিতে পারা যাইত। রাজনীতিককে সর্বদা দেখি বলিয়াই তাঁহাকে সব চেয়ে কম জানি। প্রচুর বাগ্‌জালবিস্তারের অন্তরালে লোকটা উহ্য। কর্মী আপন কর্মস্তূপের অন্তরালে গুপ্ত। কর্মী ও রাজনীতিক নেহরু অর্ধপ্রচ্ছন্ন।

প্রকৃত জীবনী-লেখক কর্মফলের স্তূপ হইতে নেহরুকে টানিয়া বাহির করিবে, বাগ্‌জালের বিস্তার ঘুচাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিবে। কাজটি সহজ নয়, নেহরু-রচিত আত্মচরিতের ইঙ্গিত না থাকিলে আরও কঠিন হইতে পারিত।

ব্যক্তিত্বের উপাদান

যে সব উপাদানে নেহরুর ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ শৈশব ও বাল্যকাল তাহার অন্যতম। সেই একাকিত্বের স্মৃতি তাঁহাকে একদিকে যেমন মুখচোরা করিয়াছে, আর-একদিকে তেমনি অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছে। নেহরু এখন আর মুখ-চোরা নন, লক্ষ লক্ষ লোকের সভায় তিনি অনায়াসে বক্তৃতা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু ওটাও বাল্যকালের মুখচোরা স্বভাবের প্রতিক্রিয়া মাত্র। মৌনী লোক যেমন অবস্থাগতিকে পড়িয়া মুখর হইয়া ওঠে, অনেকটা তেমনি। এ বিষয়টির তিনি কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আর নেহরুর ব্যক্তিত্ব একান্তভাবে অন্তর্মুখী, স্বভাবত তিনি ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, অবস্থাফেরেই মাত্র তাঁহাকে রাষ্ট্রদায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে অনেক পরিমাণে তিনি অন্তর্মুখিতা আনিয়া ফেলেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষণগুলি অন্যান্য রাজনীতিকদের বক্তৃতা হইতে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। এদেশের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ও বিদেশের মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করিলে প্রভেদটা বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার বক্তৃতা ও ভাষণগুলির সঙ্গে রোমান সম্রাট মার্কাস অরিলিয়সের 'আত্মচিন্তা'র বরঞ্চ বেশি মিল।

নেহরু-ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় উপাদান, তাঁহার হ্যারো ও কেম্ব্রিজের

শিক্ষাজীবন। এইসব বিদ্যায়তনের বালকগণ অল্পকালেই একপ্রকার 'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' আয়ত্ত করিয়া থাকে। এখানে যে সব ইংরাজ বালক পড়িতে যায় ভবিষ্যতে তাহাদের সাম্রাজ্য পরিচালনায় যোগ দিতে হয়। সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স অধিগত না করিলে তাহারা বিভিন্ন দেশের কালা আদমিকে শাসন করিবে কি প্রকারে? নেহরু সেই আবহাওয়ায় পড়িয়া ঐ ভাবটি আত্মসাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তার উপরে আসিল কেম্ব্রিজের বিজ্ঞান-শিক্ষা। নেহরু অচিরকালমধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির হাত হইতে তিনি এখন পর্যন্ত উদ্ধার পান নাই। ইহার ভালোর দিক মন্দর দিক দুইই আছে। ভালোর দিক এই যে, বৈজ্ঞানিকোচিত নির্বিকার নিস্পৃহ মনোভাব তিনি পাইয়াছেন। মন্দর দিকে হইতেছে যে, যে-বস্তু বিজ্ঞানের সীমানার বাহিরে তাহারও উপর তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি চালাইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিহার-ভূমিকম্প সম্বন্ধে গান্ধীজির ব্যাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গান্ধীজি বলিয়াছিলেন যে, অস্পৃশ্যতাপাপের পরিণাম বিহার-ভূমিকম্প। নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। (এই দুইজনের ব্যক্তিত্বের মিলের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি)। নেহরু বলিলেন যে, প্রাকৃতিক কারণেই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণ কেন ঘটে, বিজ্ঞান তাহা জানে না। প্রাকৃতিক কারণ ও নৈতিক কারণ যে একই উৎস হইতে আসিতে পারে, গান্ধীজি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শহরে আবর্জনা জমিলে মহামারী লাগিতে পারে। বিজ্ঞান বলিবে মহামারীর কারণ আবর্জনা। কিন্তু আবর্জনা কেন জমিল? ধাঙ্গড়রা ধর্মঘট করিয়াছিল। ধর্মঘট কেন করিল? বেতন বৃদ্ধি পায় নাই। বেতন বৃদ্ধি হইল না কেন? নানা কারণ থাকিতে পারে। একটি কারণ হইতে পারে যে, বেতন বৃদ্ধির

মালিকরা অবিচার করিয়াছিল। তাহা হইলে মহামারীর দূরপ্রসারী কারণ অবিচার। অবিচারের মূলে লোভ থাকিতে পারে, অজ্ঞতা থাকিতে পারে, অনেক সময়ে দুটাই একত্র থাকে। কারণ-প্রদর্শনের পথে বিজ্ঞান যেখানে থামিয়া যায়, তাত্ত্বিক সেখানে থামিতে পারে না। বিজ্ঞান how-এর উত্তর দিতে পারে, why-এর উত্তরদান তাহার এলাকার বাহিরে। বিজ্ঞানীর জগৎ প্রাকৃতিক জগৎ, তাত্ত্বিকের জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ। একজন চরমপুরুষের অভিপ্রায়ে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট, বিধৃত, পরিপালিত ও কালে বিনষ্ট হইতেছে, তাত্ত্বিক ইহা বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস থাকিলে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতকে আর মাত্র প্রাকৃতিক বলিয়া মনে করা চলে না। রাজাদেশে ঘাতক একজনকে হত্যা করিল। হত্যার কারণ কি? কেহ বলিবে খড়্গ, কেহ বলিবে ঘাতক, কেহ বলিবে রাজাদেশ, আবার কেহ বলিবে দণ্ডপ্রাপ্তের অপরাধ। কাহার কথা সত্য? রাজা নিজ হস্তে হত্যা করেন না, তাঁহার ঘাতক আছে। বিধাতাপুরুষের দণ্ডের হস্ত প্রাকৃতিক উৎপাত। সময়ে বৃষ্টি হইলে, প্রচুর শস্য ফলিলে লোকে বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করে— তবে ভূমিকম্প-জলোচ্ছ্বাসকেই বা বিধাতার দণ্ড বলিয়া গ্রহণ না করিবে কেন? গান্ধীজির ব্যাখ্যাকে পরিহাস করিয়া নেহরু বলিয়াছেন যে, ঐ ভূমিকম্প পরাধীনতা-রূপ পাপের ফলও হইতে পারে। শুধু হইতে পারে নয়, এমন অনেকবার হইয়াছে। তবে সে দণ্ড আসিয়াছে অন্য আকারে। ব্রিটিশ শাসনের একটি কুফল দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুনিকতা। ইহা নেহরুও অস্বীকার করিবেন না। তবে তিনি বলিবেন, ইহা পাপের ফল নয়, শাসননীতির ত্রুটি। তবেই দেখা যাইতেছে যে, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির ব্যাখ্যায় ও নেহরুর ব্যাখ্যায় প্রভেদ দাঁড়াইতেছে কেবল পরিভাষাগত। গান্ধীজি যাহাকে পাপ বলিতেছেন, নেহরু তাহাকে বলিতেছেন ত্রুটি।

আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। অতিভোজনে অজীর্ণ হয়। চিকিৎসক বলিবেন যে, অজীর্ণের কারণ অতিভোজন। কিন্তু অতি-ভোজন কেন? না, লোভ! এখন কেহ লোভটাকে ত্রুটি বলিবে, কেহ পাপ বলিবে। তফাৎ কতটুকু?

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে, নেহরু গান্ধীজির জীবনের অনেকগুলি মূলসূত্রই বুঝিতে পারেন নাই; না পারিবার কারণ, নেহরুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আমার আপত্তি নাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকেও থাকিতে পারে। যীশু যখন বলিয়াছিলের যে, 'সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও'— তখন তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যেই এ কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। আবার যীশু যখন বলিয়াছিলেন যে, 'অপরের সম্বন্ধে সেইরূপ আচরণ করিবে, যেমন আচরণ তুমি নিজের সম্বন্ধে আশা করো'— ইহাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রসূত। নিস্পৃহ নিরপেক্ষ ভাবকেই বলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। গীতার সুখদুঃখে শীতগ্রীষ্মে অনুদ্বিগ্ন থাকিবার উপদেশ নিস্পৃহতার নিরপেক্ষতার চরম। কিন্তু নেহরুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কেম্ব্রিজ গ্র্যাজুয়েটের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। ছোট ছেলে হাতে একটা দূরবীন পাইলে যেমন মা'র মুখের প্রতিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অনেকটা তেমনি। 'সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও' এই উপদেশ বৈজ্ঞানিকেরও ভুলিলে চলে না। কেননা, যাহা বিজ্ঞানের নয়, তাহার উপরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি চালাইতে গেলে সত্যও অধিগত হয় না, বিজ্ঞানও হাস্যাস্পদ হয়।

নেহরুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান গান্ধীজির প্রভাব। বর্তমান নেহরুকে আমরা গান্ধীজির হাত হইতেই পাইয়াছি।

গান্ধীজি নিজে একাধিকবার নেহরুকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন— এই প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। গান্ধীজির মধ্যে দুইটি ব্যক্তিত্ব ছিল— তিনি লোকোত্তর রাজনীতিক

আবার লোকোত্তর মহাপুরুষ। নেহরু গান্ধীজির কোন্ ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকারী? রাজনীতিক গান্ধীর উত্তরাধিকারী নেহরু। লোকোত্তর গান্ধীজির উত্তরাধিকারী সম্ভব নয়, কাজেই সে দাবির প্রশ্ন তোলাই অনুচিত। গান্ধীজি ভারতীয় জীবনে তথা ভারতীয় রাজনীতিতে অভয়মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্য ও পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন; এ দুটি গুণ নেহরু পূর্ণমাত্রায় গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। গান্ধীজির মুখের 'ডরো মৎ' ধ্বনিই নেহরুর মুখে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য ও পন্থায় যতদূর মিলাইয়া চলা যায়, নেহরু সে চেষ্টা করিতেছেন সত্য। ব্যক্তিগত সাধুতায় ও আদর্শনিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় ও নিস্পৃহতায় নেহরু গান্ধীজির যোগ্য শিষ্য, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুজনের মধ্যে ঐক্যকে আর বেশী দূর টানিয়া লওয়া উচিত হইবে না, কেননা, গান্ধীজি ও নেহরু জীবনের এক স্তরের লোক নহেন; নেহরু লৌকিক পুরুষ, গান্ধীজি লোকোত্তর পুরুষ। ঘটনাক্রমে দুজনের জীবনচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে দুটি বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই তাহাদের একস্তরীয় মনে করা উচিত নয়।

গান্ধীজির জীবনের সহিত নেহরুর জীবনের মর্মগত মিল না থাকিতে পারে— কিন্তু গান্ধীবাদকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে বাধা নাই। আত্মচরিতের সমস্ত মতামতকে নেহরু আজও সত্য মনে করেন কিনা জানি না, কিন্তু তা যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, নেহরু গান্ধীবাদের অনেক-গুলি মূলসত্যই বুঝিতে পারেন নাই, এবং না পারিয়া তাহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর যেহেতু বিদেশে তাঁহার পুস্তকগুলির বহুল প্রচার, বিদেশী পাঠক ঐ পরিমাণে গান্ধীবাদকে ভুল বুঝিয়াছে। গান্ধীজির নিজের মুখের সরল কথা যাহারা বুঝিতে অক্ষম, নেহরুর ব্যাখ্যাকে তাহারা অনায়াসে বুঝিয়াছে এবং অনেক অনায়াস বোঝার

মতোই ভুল বুঝিয়াছে। গান্ধীজিকে লোকে বোঝে ইন্স্টিংক্ট্-এর দ্বারা, নেহরুকে বুঝিতে হয় ইন্টেলেক্ট্-এর দ্বারা; শেষোক্ত উপায়ে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ, পাশ্চাত্যে তাই নেহরুর এত সমাদর। নেহরুর লিখিত বইগুলি Intelligent West's Guide to Gandhismএ পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিণামে গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠায় সুবিধা হইতেছে কি অসুবিধা হইতেছে বলা সহজ নয়।

আত্মচরিত

জওহরলালের আত্মচরিতে 'প্যারাডক্সেস্' নামে একটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়টি গান্ধীজির মতবাদের সমালোচনা। নেহরুর দৃষ্টিতে ব্যক্তি-গান্ধীতে ও গান্ধীবাদে যেসব স্বতোবিরুদ্ধতা আছে বলিয়া মনে হইয়াছে তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে। শুধু নেহরুর নয়, অনেক মনীষী ব্যক্তির দৃষ্টিতেই গান্ধীজির জীবন স্বতোবিরুদ্ধতায় পূর্ণ। কিন্তু বস্তুতঃ ব্যক্তি-গান্ধীতে ও গান্ধীবাদে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য নাই। গান্ধীবাদে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে, গান্ধীচরিত্রে ত্রুটি থাকাও বিচিত্র নয়—কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। তবে কখনো কখনো দৃষ্টি-দোষে নিতান্ত সরল বস্তুকে জটিল, সমন্বিত মতকেও বিষম বলিয়া মনে হইতে পারে। চেষ্টা করিলে এমন স্বতোবিরুদ্ধতা প্রত্যেক মনীষীর জীবনে পাওয়া যায়, নেহরুর জীবনেও পাওয়া অসম্ভব নয়। মানব-মাহাত্ম্যের যত উর্ধ্ব স্তরে যাওয়া যায় ততই স্বতোবিরুদ্ধতা এবং সলল প্রকার অসামঞ্জস্য কমিয়া আসিতেছে দেখা যায়। জন্মগত বৈষম্য ও কর্মগত অসাম্য সাধনার দ্বারা যে যত পরিমাণে ক্ষয় করিতে পারে সে তত মহৎ হইয়া ওঠে। নীচের দিকে নামিলে পশুর মধ্যে 'প্যারাডক্স' নাই, নিছক পশুস্বভাবে সে মগ্ন। আবার উপরের দিকে

উঠিলে লোকোত্তর পুরুষের স্তরেও প্যারাডক্স নাই, সে আপন নিছক মানব-মাহাত্ম্যে মগ্ন। মাঝখানে সাধারণ-মানব-স্তরে প্যারাডক্স অবিরল, তাহার মানুষ-স্বভাব ও পশুভাব এ দুয়ে মিলিয়া তাহাকে প্যারাডক্স-এর নাগরদোলায় নিরন্তর দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে।

নেহরুর আত্মচরিতের 'প্যারাডক্সেস্' অধ্যায়ের বিশদ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মহাত্মাজির মধ্যে আর-যে ত্রুটিই থাক, স্বতো-বিরুদ্ধতার ত্রুটি নাই। নেহরু বলিয়াছেন যে, গান্ধীজি কখনো কখনো নিজকে সোশালিস্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গান্ধীজি কোথাও যদি তাহা করিয়া থাকেন, তবে সাধারণ অর্থেই নিজেকে সোশালিস্ট বলিয়াছেন, সোশালিস্টের যে বিশেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে সে অর্থে করেন নাই, করিতে পারেন না।

এখানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাইতে পারে। গান্ধীজি ব্যক্তির উপরে ঝোঁক দিয়া সামাজিক সমস্যা সমাধানে অবতীর্ণ। তাঁহার মতে ব্যক্তিই unit, সোশালিস্টসের মতে unit হইতেছে 'সমাজ'। তাহারা সমাজের উপর ঝোঁক দিয়া সমস্যা সামাধারে অগ্রসর। তাহাদের মত এই যে, পরিবেশ বদলাইয়া দিলে অর্থাৎ odjective conditionকে অনুকূল করিয়া দিলে অভীষ্ট পরিবর্তন দেখা দিবে। গান্ধীজি এটি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, subjective condition-এর বদল করিতে হইবে। গান্ধীজি subjective condition শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, তার পরিবর্তে 'change of heart' শব্দটিতে তিনি অভ্যস্ত। সোশালিস্টদের অভিধানে উক্ত শব্দটি নাই— তার পরিবর্তে তাহারা 'social mind' শব্দটি ব্যবহার করে। এখন, 'change of heart' এবং 'social mind'—এই শব্দ দুটির মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্তমান। একটির ঝোঁক সমষ্টির উপরে, একটির ঝোঁক ব্যষ্টির উপরে; আর mind শব্দটি হইতে বোঝা যায় যে,

সোশালিস্টদের আবেদন ইনটেলেক্‌ট্‌-এর প্রতি, গান্ধীজির আবেদন স্পিরিচুয়ালিটির প্রতি। গান্ধীজি বলেন যে, মানুষের ভিতরটা বদল করিতে পারিলে তাহার কর্মের চেহারার বদল হইবে, আর তাহার কর্মের চেহারার বদল হইলে সমষ্টিগত কর্মের রূপ বদলাইয়া গিয়া সমাজেরও অভীষ্ট পরিবর্তন ঘটিবে। গান্ধীজি ভিতর হইতে কাজ আরম্ভ করিতে চান, সোশালিস্টরা চায় বাহির হইতে কাজ আরম্ভ করিতে।

গান্ধীজি ভিতর হইতে কাজ আরম্ভ করিতে চাহেন বলিয়াই তিনি ধর্ম শব্দটির উপরে জোর দিয়াছেন— তাঁহার মতে ধর্ম-সাধনার একমাত্র পন্থা 'অহিংসা'— এই ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য সত্যে উপনীত হওয়া। গান্ধীজির মনে একটি ধ্রুব বিশ্বাস বর্তমান, সেটি হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভত্বে বিশ্বাস। সোশালিস্টদের এরূপ কোনো বিশ্বাস নাই। খুব সম্ভব বিশ্বাস শব্দটিকেই তাহারা আমল দিতে রাজি নয়।

নেহরু বলিয়াছেন যে, গান্ধীজি জনসাধারণের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করিতে চান, অন্নবস্ত্রের সংস্থান হোক চান, কিন্তু তিনি অতি-প্রাচুর্য চান না। কেন যে তিনি অতিপ্রাচুর্য চান না তাহা এবার বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার বিশ্বাস, এই অতিপ্রাচুর্যের মধ্যে শুভ নাই বরঞ্চ তাহা শুভত্বর প্রতিকূল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ধনীদের জীবনযাত্রার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। বলেন যে, তাহারা তো অতিপ্রাচুর্যের মধ্যেই বিরাজমান, কিন্তু তাহাদের জীবন কি গ্রহণীয় আদর্শ? তা যদি না হয়, তবে অপ্রাচুর্য হইতে জনসাধারণকে অতি-প্রাচুর্যে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিলে তাহাদের কি উপকার করা হইল? তাঁহার মতে অতিপ্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্য দুইই নিন্দনীয়, কারণ দুইই শুভ-উদ্বোধনের প্রতিকূল। তাঁহার মতে ব্যক্তির প্রয়োজনের মাপকাঠি 'moral necessity'। নৈতিক জীবনযাপনের পক্ষে যেটুকু

প্রয়োজন, মাত্র সেইটুকুকেই তিনি স্বীকার করেন ; তাহার কম ও বেশি দুইই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর

এই সূত্রে নেহরু দুটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, একটি কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা, দ্বিতীয়ত ধনীদের ন্যাসরক্ষক বা ট্রাস্টিশিপ মনোভাব। নেহরু প্রথমটির স্বপক্ষে এবং দ্বিতীয়টির বিপক্ষে, অন্ততঃ যে সময় তিনি আত্মচরিত লিখিতেছিলেন সে সময়ে দ্বিতীয়টির বিপক্ষে ছিলেন।

গান্ধীজি কেন যে কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরুদ্ধে তাহা সহজেই বোঝা যায়। উক্ত প্রথা সংযম নয়, উহা সংযত অসংযম মাত্র। গান্ধীজি সংযত অসংযম চান না, তিনি আন্তরিক সংযম চান, কারণ তিনি ভিতর হইতে কাজ করিবার পক্ষপাতী। সোশালিস্টের পক্ষে উক্ত প্রথা গ্রাহ্য, কেননা সে বাহিরের ফলটাকে মাত্র গণনা করে। সন্তানের সংখ্যা গুণিয়া সে নিরস্ত, তাহা আন্তরিক সংযমের ফলে হইল কি নিয়ন্ত্রিত সংযমের ফলে হইল তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। তাহার পক্ষে সংযম একটা সামাজিক গুণ, অসংযমের ফলে সমাজের ক্ষতি না হইলেই সে সন্তুষ্ট। গান্ধীজির পন্থা বিপরীত। তাঁহার মতে সংযম আন্তরিক গুণ। তিনিও অবশ্য সামাজিক ক্ষতি চান না, কিন্তু ব্যক্তি 'সংযত অসংযম' আচরণ করিলে যে সমাজ লাভবান হয় ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তি 'সংযত অসংযম' আচরণ করিলে তাহার সমষ্টিগত সমাজিক ফল কখনোই শুভ হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তটি হইতে গান্ধীবাদের সহিত সোশালিজমের কোথায় মূলগত প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, ধনীদের ন্যাসরক্ষক মনোভাব। সমাজতন্ত্রীরা তথা নেহরু ইহা বিশ্বাস করেন না। কেন যে করেন না তাহার কারণ 'change of heart'-তত্ত্বে তাঁহাদের বিশ্বাসের অভাব। তাঁহারা

বলিবেন, এমন হয় না, কেননা হয় নাই। গান্ধীজি বলিবেন যে, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারিলে সমস্তই হইতে পারে। ব্যক্তিগত শুভ-বুদ্ধির উপরে সোশালিস্টদের বিশ্বাস নাই। অতএব এ তর্কের মীমাংসা কেমন করিয়া হইবে? আপাততঃ তাহাদেরই জিত, যেহেতু গান্ধীজির কল্পিত পরিবর্তন সত্যই ব্যাপকভাবে কোথাও দেখা যায় নাই। কিন্তু বৃহৎ জয়পরাজয়কে বর্তমানকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা উচিত নয়। গান্ধীজি দূরকালের প্রেক্ষিতে দেখিয়াছেন, তিনি 'প্রফেট'; সমাজতন্ত্রীরা কেবল ইহকালেই দেখিয়া ক্ষান্ত, তাহারা কর্মী মাত্র।

এই প্রসঙ্গে ক্যাপিটালিজম্-এর আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। গান্ধীজি ক্যাপিটালিজম্-এর বর্তমান রূপটা পছন্দ করেন না; সোশালিস্টরা সর্বতোভাবে ক্যাপিটালিজমের বিরোধী। সমাজতন্ত্রীরা যন্ত্রকে স্বীকার করে; গান্ধীজি যন্ত্রকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাহার বর্তমান রূপকেও স্বীকার করেন না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, যন্ত্রের অসংযত ব্যবহারের ফলেই ক্যাপিটালিজম্ বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কাজেই যন্ত্রের ব্যবহারে যদি সংযত হওয়া যায়, তবে ক্যাপিটালিজমের রূপেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সমাজতন্ত্রী বলিবে যে, সেও যন্ত্রের সংযত ব্যবহার চায়, তবে সে সংযম রাষ্ট্রায়ত্ত। গান্ধীজি বলিবেন যে, সে সংযম শুভবুদ্ধি-অনুপ্রাণিত ব্যক্তির দ্বারাই হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রী বলিবে যে, ধনবাদের মূলে ধনীর লোভ, সে যাহাতে লোভ প্রকাশ করিতে না পারে রাষ্ট্র তাহা দেখিবে। গান্ধীজি বলিবেন, লোভের প্রকাশকে রাষ্ট্রবলের দ্বারা ক্ষান্ত করিলে কি লাভ হইবে? মনে যদি লোভ থাকিয়া যায়, তবে প্রকাশের নূতন পন্থা সে খুঁজিয়া বাহির করিবে, কাজেই একেবারে মূলে আঘাত করো— লোভটাকেই দূর করো। আর লোভ যদি একবার দূরীভূত হয়, তবে যন্ত্রের ব্যবহারে

আপনি সংযম আসিবে, তখন ধন থাকিয়াও ধনবাদের চেহারায় শুভ পরিবর্তন আসিবে। সমাজতন্ত্রী বলিবে, তাহা হইবার নয়, যেহেতু হাতে যন্ত্র পড়িলে লোভ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তর্ক যেখানে আসিয়া থামিল সেখানে সেই মৌলিক প্রভেদ— গান্ধীজির মতে ব্যক্তি বড়, শুভবুদ্ধি তাহার চালক ; সমাজতন্ত্রীর মতে সমাজ বড়, সমাজের সমষ্টি-গত বুদ্ধি, যাহার অপর নাম রাষ্ট্র, তাহাই সমাজের চালক। এ প্রভেদের মীমাংসা কাল ছাড়া আর কে করিতে পারিবে ?

এসব কথা এত বিস্তারে বলিবার কারণ জওহরলালের মতামত আলোচনার সুযোগ পাইবার আশায়— আর যেহেতু মতামত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন মাত্র, কাজেই সেই সূত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যাইবার আশায়। জওহরলাল পুরাপুরি সমাজতন্ত্রী নন, কিন্তু তাঁহার মনের ঝোঁকটা সমাজতন্ত্রবাদের দিকেই। গান্ধীজির প্রতি আছে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা— কিন্তু মনটা ঝুঁকিয়া রহিয়াছে সমাজতন্ত্রী-সুলভ মতবাদের দিকে। এমন হইবার কারণ, জওহরলালের মধ্যে দুটা ব্যক্তিত্ব আছে— একজন ভারতমুখী, অপরজন পাশ্চাত্যমুখী। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কাহার জয় হইবে, কিম্বা দুয়ের সমন্বয়ে নূতন এক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হইবে কি না, তাহার উপরে তাঁহার নিজের ও আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার পরবর্তী পুস্তকের নাম 'ভারত-আবিষ্কার'। কোন্ ভারতবর্ষকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন ? ভারতবর্ষ একটা নয়। গ্রীকদের দৃষ্টিতে যে ভারতবর্ষ দেখা দিয়াছিল তাহা এক স্বতন্ত্র দেশ। তাহারা ভারতবর্ষের নামে 'গ্রীকায়িত ভারতবর্ষ'কে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। পরবর্তী অধিকাংশ পাশ্চাত্য মনীষী ভারতবর্ষ বলিতে সেই বস্তুকেই দেখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্যে শিল্পে যেখানে একটু বৈদেশিক ছোঁয়াচ পাইয়াছেন অমনি তাঁহারা সমস্বরে 'গ্রীস গ্রীস' বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন। সে চীৎকারের এখনো বিরাম হয় নাই। পশ্চিমের হাতে তৈরি-হওয়া জওহরলাল যে সেই 'গ্রীকায়িত ভারতবর্ষ'কেই আবিষ্কার করেন নাই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

জওহরলালের ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণে দেখিতে হইবে যে, তিনি আদর্শ ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি না। গান্ধীজির চরিত্রে এই সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছিল— তাঁহার মহত্ত্বের এটি একটি লক্ষণ। প্র্যাক্‌টিক্যাল ও আইডিয়ালকে তিনি সমন্বিত করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, নিজেকে তিনি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়ালিস্ট' বলিতেন। জওহরলালে এই সমন্বয় আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আদর্শের দিকেই তাঁহার মনটা উন্মুখ।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেসের নীতি ও আচরণ সম্বন্ধে গান্ধীজি এতই সংযত ছিলেন যে, নেহরু তাঁহাকে 'নরমপন্থীদের চেয়েও নরম' বলিয়াছেন—শুধু তাহাই নয়, নেহরুর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গান্ধীজি দেশীয় রাজাদের প্রতি অকারণ পক্ষপাতী। এখন, কংগ্রেসের উক্ত নীতি ও আচরণের কারণ কি? গান্ধীজি জানিতেন যে, ইংরেজ-শাসন দূরীভূত হইলে দেশীয় রাজ্যের সমস্যা আপনিই সরল হইয়া আসিবে। এ কথাটি তখনকার দিনে অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই, জওহরলালও পারেন নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পরে যে ভাবে, যেমন অনায়াসে দেশীয় রাজ্য-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল— তাহাতে গান্ধীজির দৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। দেশীয় রাজ্যে অযথা গরম পন্থা অবলম্বন করিলে কংগ্রেস তখন নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিত মাত্র— মূল কাজের তাহাতে বিঘ্ন ঘটিত। সুদক্ষ সেনাপতি যেমন গৌণ লক্ষ্যকে সাময়িক ভাবে উপেক্ষা করিয়া প্রধান লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেসের নরম পন্থা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র সমান

শক্তিশালী হইতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোনোখানেই শক্তিশালী হওয়া যায় না। কংগ্রেসের শক্তিসামর্থ্যকেও তেমনি হিসাব করিয়া গান্ধীজির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে— অযথা সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার মতো শক্তি-প্রাচুর্য কংগ্রেসের কোনোকালেই ছিল না। এই বিচক্ষণতা প্রমাণ করিয়া দেয় যে, গান্ধীজি সত্যসত্যই প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়ালিস্ট ছিলেন—আর ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রমাণ করিয়া দেয় যে, নেহরু আদর্শ ও ব্যবহারিক কার্যের সমন্বয়ের রহস্য অনবগত ছিলেন, আর এখনো সম্পূর্ণ অবগত নহেন।

রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে নেহরুর কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে এই সমন্বয়-সাধনের উপরেই নির্ভরশীল। নেহরু এখন আর প্রচারধর্মী রাজনীতিক নহেন, বরঞ্চ প্রচারধর্মী রাজনীতিকরা এখন তাঁহার বিপরীত শিবিরে। প্রচারধর্মী রাজনীতিকগণের পক্ষে উক্ত সমন্বয় তেমন অত্যাবশ্যক নয়— কারণ নিজেদের উক্তির দায়িত্ব তাহাদের পালন করিতে হয় না। কিন্তু স্টেটসম্যানকে বা রাষ্ট্রনায়ককে প্রতিপদে আদর্শ ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয় করিয়া চলিতে হয়। তাহার প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়ালিস্ট না হইলেই নয়। বরঞ্চ শুধু প্র্যাক্‌টিক্যাল হইলে তাহার কাজ একরকম চলিয়া যায়— কিন্তু শুধু আইডিয়ালিস্ট হইলে একেবারেই চলে না।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এরূপ মানের রাজনীতিক সংসারে বিরল— তবু তো সংসারের কাজ চলিতেছে। কাজ যে চলিতেছে তার কারণ, পূর্বোক্ত মানের বিকল্প হিসাবে আর একটা মান সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেসব রাজনীতিক রাষ্ট্র-পরিচালনায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধিতে প্রথমশ্রেণীর হইয়াও বিশ্বাসে বা creed-এ সাধারণ পর্যায়ের লোক। তাঁহাদের পদাতিক শ্রেণীর বিশ্বাসই তাঁহাদের পক্ষবিহারী বুদ্ধিকে সংযত করিয়া রাখে— ফলে তাঁহারা কখনো নিজেদের সাধ্যের বাহিরে যান নাই। উইলিয়ম

পিট ইহার সার্থক দৃষ্টান্তস্থল। এডমণ্ড বার্ক ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত। পিটের ছিল প্রথম শ্রেণীর মনীষা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস। তাঁহার বিশ্বাস সমকালীনদের বিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। বার্কের ছিল প্রথম শ্রেণীর মনীষার সহিত প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাস—সমকালীনগণের পক্ষে ছিলেন তিনি দুর্বোধ্য। নেহরুর বুদ্ধি ও বিশ্বাস দুইই প্রথম শ্রেণীর। ইহা গুণ, কিন্তু রাজনীতিকের পক্ষে গুণ কি না সন্দেহ। ঘটনাচক্রে গুণই দোষ হইতে পারে। রাষ্ট্র-পরিচালনায় নেহরু সবেমাত্র নামিয়াছেন—তাঁহার ভবিষ্যৎ এখনো সুদূরপ্রসারী, কাজেই কি পরিমাণে তিনি সিদ্ধকাম হইবেন এখনো কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধির সহিত প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসের যোগাযোগ যে একটা রন্ধ্র, তাহা নিশ্চিত। এই রন্ধ্রকে তিনি কি পরিমাণে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন, তাহার উপরে রাষ্ট্রনায়ক নেহরুর সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে।

এবারে নেহরুর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে—তাহার ফলে নেহরুর ব্যক্তিত্ব ও গান্ধীজির সঙ্গে তাহার প্রভেদ দুইই প্রকট হইয়া উঠিবে।

আত্মচরিতের What is Religion? শীর্ষক অধ্যায়ে নেহরু লিখিতেছেন—

I am afraid it is impossible for me to seek harbourage in this way. I prefer the open sea, with all its storms and tempests. Nor am I greatly interested in the after life, in what happens after death. I find the problems of this life sufficiently absorbing to fill my mind. The traditional Chinese outlook, fundamentally ethical and yet irreligious or

tinged with religious scepticism, has an appeal for me, though in its application to life I may not agree. It is the *Tao*, the path to be followed and the way of life that interests me ; how to understand life, not to reject it but to accept it, to conform to it and to improve it. But the usual religious outlook does not concern itself with this world.

উদ্ধৃত অংশ হইতে নেহরুর ধর্ম্মতের পরিচয় যেমন পাওয়া যাইবে, তেমনি ভারতীয় পুরাণী প্রজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয়ের অভাবও জানিতে পারা যাইবে। ধর্ম ইহজগতের সহিত সংস্রবহীন—এ সত্য কোথায় তিনি পাইলেন ? ব্যক্তিবিশেষের আচরণ হইতে এ-সত্য গ্রহণ করিলে চলিবে না, শাস্ত্র ও ধর্মগুরুদের বাক্য ও আচরণ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। তাঁহার গুরু গান্ধীজি কি ইহজগৎকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? বুদ্ধ কি সারাটা জীবন ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান নাই ? শঙ্করের চতুর্মঠ প্রতিষ্ঠা কি জগৎ-উপেক্ষার দৃষ্টান্ত ? ধর্ম, বিশেষ হিন্দুধর্ম, যে জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন, এই ধারণা নিতান্ত একদেশদর্শিতার পরিণাম।

আর একটি বিষয় জানিতে পারা যায় যে, নেহরুর মনের সাধারণ প্রবণতা আধ্যাত্মিকতার দিকে নয়—নীতিমার্গের দিকে। 'তাও' ধর্মের পরিবর্তে তিনি বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ করিতে পারিতেন, কারণ তথাগত-প্রচারিত ঈশ্বর-উদাসীন বৌদ্ধধর্ম মানুষের ঐহিক জীবনের নীতি-নির্দেশের পন্থা ছাড়া আর কি ? অনেক পণ্ডিত ইহাকে ধর্ম না বলিয়া জীবন-নীতির সমষ্টি মাত্র বলিয়াছেন।

এখানে একটি বিষয় বিচার্য। ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম ভারতে টিঁকিতে পারিল না, হিমালয়ের অপর পারে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কেন ? ভারতীয় মন মূলতঃ আধ্যাত্মিক। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম তাহার

আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই তাহাকে সরিতে হইয়াছিল। আর মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে তাহার স্থায়িত্বের কারণ রবীন্দ্রনাথ 'জাপানযাত্রী' পুস্তকের শেষাংশে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সত্তার সঙ্গে মঙ্গোলীয় সত্তার প্রধান প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত সত্তা একটি একতলা বাড়ির মতো, প্রথমোক্তদের সত্তা দোতলা বাড়ি। দোতলা বাড়িটির উপরের তলায় আধ্যাত্মিক জীবন। একতলা বাড়িটির ঐহিক জীবনের কোঠা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই ঐহিক জীবনের শুভাশুভের চেয়ে গভীরতর বার্তা যে ধর্মে নাই, সেই বৌদ্ধধর্ম ও 'তাও'-পন্থা মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে পাকা আসন করিয়া লইয়াছে। নেহরুর 'তাও'-বাদে অনুরক্তি সাময়িকভাবেই সত্য বলিয়া মনে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা গভীরতর হইলে তাও-বাদকে তিনি অতিক্রম করিয়া যাইবেন আশা করা যাইতে পারে। ঠিক এই কারণেই বুদ্ধ ও অশোকের আদর্শের প্রতি তাঁহার এত নিষ্ঠা। ভারতীয় পতাকায় অশোক-চক্র, ভারতীয় শিলমোহরে অশোক-স্তম্ভ—সেই অনুরক্তির বাহ্য প্রকাশ।

গান্ধীজি মূলতঃ আধ্যাত্মিক পুরুষ, নেহরু নৈতিক পুরুষ মাত্র; গান্ধীজি জগৎকে স্বীকার করিয়াও ভগবানকে স্বীকার করিয়াছেন, নেহরু জগৎকে স্বীকার করিয়া আর কোনো গভীরতর তৃষ্ণা অনুভব করেন না; নেহরু জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্বকে স্বাগত করেন, গান্ধীজি তাহাদের সবলে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের শান্তিতে লইয়া যান; নেহরু সেই সমুদ্রের নাবিক যাহাতে ঝড় আছে অথচ কূল নাই, গান্ধীজির সমুদ্রে ঝড়ও আছে কূলও আছে; নেহরু নাবিক মাত্র, গান্ধীজি দিশারী। দুইয়ে প্রভেদ বিস্তর।

নেহরুর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার এখানেই শেষ মনে করিলে অন্যায় হইবে— কারণ ইহার পরে আছে 'ভারত-আবিষ্কার।' সে গ্রন্থের

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, গুরু ও শিষ্যের প্রভেদ অনেকটা ঘুচিয়া আসিয়াছে।

ভারত-আবিষ্কার

রাজনীতিকদের জীবন এক বিচিত্র ব্যাপার। যে আন্দোলন তাঁহারা সৃষ্টি করেন, তাহারই আবেগে তাঁহাদের জীবন তরঙ্গিত হইতে থাকে, ফলে তাঁহাদের মধ্যে কাজে ও চিন্তায় কদাচিৎ সমন্বয় ঘটে। তাঁহাদের চিন্তার সূত্র দৈনিক মাপে কাটা, সে সূত্র দীর্ঘায়িত হইয়া অদ্যতনের সঙ্গে কল্যকে, গতকল্যকে অর্থাৎ চিরন্তনকে সম্বদ্ধ করিতে পারে না। সেইজন্য যখন তাঁহাদের কর্মজীবনের অবসান ঘটে, তাঁহারা দেখিতে পান যে, অসংখ্য অদ্যতনের ছিন্নসূত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহাদের সার্থকতা নাই। এই কারণেই অধিকাংশ রাজনীতিকের লিখিত জীবনচরিত অদ্যতনের ডায়ারি মাত্র। অদ্যতনের সঙ্গেই তাহার লীলা শেষ হইয়া যায়। নিরন্তর আন্দোলনে তরঙ্গিত হইতে থাকেন বলিয়া রাজনীতিকগণ সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে সাজাইয়া গুছাইয়া ইতিহাস করিয়া তুলিতে পারেন না, তাহা তথ্যের স্তূপ মাত্র হয়, তত্ত্বের লেশ তাহাতে থাকে না। যে জীবন থিতাইতে পারিল না সেখানে তত্ত্বের পলি জমিবে কি প্রকারে? আর তত্ত্বের পলি-প্লাবন ব্যতীত জীবন তো উর্বর হইতেই পারে না।

নেহরুর জীবন ও জীবনচরিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তার প্রধান কারণ, নেহরু মূলতঃ ভাবুক, মূলতঃ তিনি কর্মী নন, তাঁহার কর্ম তাঁহার ভাবুকতারই প্রক্ষেপ—গান্ধীজি যেমন মূলতঃ সাধক, তাঁহার কর্ম যেমন তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনারই প্রক্ষেপ। এইজন্যই নেহরুর আত্মচরিত বা বিখ্যাত ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ রাজনীতিকগণ কর্তৃক লিখিত পর্যায়ে ঠিক

পড়ে না। তাহাদের মধ্যে কর্মের আন্দোলনের নীচে ভাবের পলিমাটি আছে, সেই পলির গভীরতার দ্বারাই এসব বইয়ের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

জেলে বসিয়া নেহরু তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভারত-আবিষ্কার' লিখিয়াছেন। জেলের মধ্যে কাজ করিবার অবকাশ নাই বলিয়া তিনি ভাবিবার সময় পাইয়াছেন, তাহার রোমন্থনে তত্ত্বে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ভাবুকতা স্বভাবসিদ্ধ না হইলে এমনটি হওয়া সম্ভব হইত না।

ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থে তিনি ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি তত্ত্বে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব কতদূর গ্রাহ্য, কতদূর বিচারসহ, সেটা তর্কের বিষয়। সে তত্ত্ব কি পরিমাণে সত্য অর্থাৎ সর্বজনগ্রাহ্য, সেটাও তর্কের বিষয়। কিন্তু এক বিষয়ে সন্দেহ নাই, নেহরু যে ভারত-আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের পরিচয় যেমনি থাক্ না কেন, নেহরুর স্পষ্ট পরিচয় আছে—নেহরুর গভীরতর পরিচয়। আত্মজীবনীতে তাঁহার যে ভারত-ধারণা ছিল, এখানে তাহা গভীরতর; আত্মজীবনীতে পাশ্চাত্ত্যের হাতে-গড়া যে নেহরুকে দেখিয়াছি, এখানে তিনি ভারতের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার স্বভাবদত্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যাইবার নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দূরবীনটা এখানে তাঁহার চোখ হইতে অপসারিত। বস্তুতঃ বইখানাকে ভারত-আবিষ্কার না বলিয়া নেহরু-আবিষ্কার বলাই উচিত। ভারতের পটে নেহরু এখানে নিজেকে আবিষ্কার করিয়াছেন, কিম্বা নিজের বিশ্বাস ও ধারণাকে ভারতের পটে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদেরই আবিষ্কার করিয়াছেন। বইখানাকে বাস্তব-ঘেঁষা ইতিহাস মনে করা উচিত হইবে না, উহা ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নেহরুর ধারণা। সাধারণ ইতিহাস তন্ময়, ভারত-আবিষ্কার মন্ময়। একান্ত 'সাবজেক্‌টিভ্‌' ও 'ইন্‌ডিভিজুয়ালিস্‌টিক' নিজের ব্যক্তিত্বের

ফ্রেমে ভারতের মানচিত্র বাঁধাইয়া নেহরু পাঠককে উপহার দিয়াছেন। কেন এমন হইল দেখা যাক।

নেহরু-চরিত্র যে এমন চিত্তাকর্ষক তার কারণ, তাঁহার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, সে দ্বন্দ্বের বিরাম আজও ঘটে নাই, কখনো ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না; তেমন ঘটিলে নেহরু আর নেহরু থাকিবেন না। তাঁহার চরিত্রের যুযুধান মূল মল্লদ্বয়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমূহবাদ। স্বভাবতঃ নেহরু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, শিক্ষায় ও যুগধর্মগুণে তিনি সমূহবাদী; স্বভাবের গুণে, পারিবারিক আবহাওয়ার গুণে তিনি অভিজাত, আর শিক্ষায় ও যুগধর্মের গুণে তিনি অতিজাত। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবনরঙ্গভূমি ক্ষতবিক্ষত, এ দুইকে সমন্বিত করিবার একটা চেষ্টা তাঁহার মধ্যে আছে; কিন্তু সমন্বয় হইয়াছে বলিতে পারি না। ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ রচনা সেই সমন্বয়ের একটা চেষ্টা। বইখানার সংরচন-নীতি ঐ চেষ্টারই একটা ফল।

বইখানাতে তিনটি স্তর আছে—প্রাচীন ইতিহাস, আধুনিক রাজনীতি, আর নেহরুর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কাহিনী বা নেহরুর ব্যক্তিত্ব। দেশের পূর্বতন ও অদ্যতনকে যে সূত্রে তিনি গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহা লেখকের ব্যক্তিত্ব। এমন করিয়া ইতিহাস লেখা হয় না, কাব্য লেখা হইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়, এমন সূত্রে মালা গাঁথিবার ইতিহাস রচনার কথা তাহার মনেই আসিবে না। ব্যক্তিগত দৃষ্টির দূরবীন ছাড়া নেহরু এক-পা অগ্রসর হন নাই, হইতে পারেন বলিয়াই বোধ হয় না। তিনি যে ভারত-আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাও ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যে নয়, নিজের সুগভীর দেশপ্রেমকে কোনো একটা সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশাতেই প্রাচীন ইতিহাসের বিস্মৃত বীথিকার মধ্যে উধাও হইয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

নেহরু অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যের দৃষ্টি লইয়া তিনি ভারত-আবিষ্কারে বহির্গত হইয়াছিলেন। এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি পাশ্চাত্যের হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অবচেতনে সুগভীর ভারতীয়ত্ব বিরাজমান। তিনি বলেন যে, ভারতীয় রক্তধারা তাঁহার শরীরে চলমান, নেহরুর পিতৃভূমি কাশ্মীরের রক্ত বলিলেই অধিকতর সত্য হইত। জেল হইতে, জটিল কর্ম্মজীবন হইতে যখনই তিনি অবসর পাইয়াছেন, তখনই কাশ্মীরের পাহাড়ে ছুটিয়া গিয়াছেন। যখন কাশ্মীরের পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব হয় নাই, হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন, হিমালয়ের গিরিমালা তাঁহাকে পিতৃভূমি কাশ্মীরের গিরিমালাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। কাজেই পাশ্চাত্য দৃষ্টি তাঁহার থাকিলেও ভারতীয় রক্তধারার প্রেরণাতেই তিনি ভারত-আবিষ্কারে চালিত হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে একজন পাশ্চাত্যবাসীর সঙ্গে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যটাই বেশি চোখে পড়ে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো মনীষী, যেমন হ্যাভেল ও নিবেদিতা, ভারতীয় দৃষ্টি আয়ত্ত করিয়া লইয়া যে-ভারতকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে আমরা বেশ চিনিতে পারি, আপন বলিতে পারি। কিন্তু নেহরুর পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত ভারতকে সম্পূর্ণভাবে আমরা চিনিতে পারি না, তেমন করিয়া আপন বলিতে পারি না, তাঁহার আবিষ্কৃত ভারত সম্পূর্ণ ভারতীয় নয়, তাহার মধ্যে গ্রীসের মিশল আছে, আন্তর্জাতিকতার মিশল আছে। এমন যে হইল তার কারণ, নেহরুর ভারত তন্ময় নয়, নেহরুর দ্বারা মনোময়। আর নেহরুর মধ্যে যে দুইজন মল্ল প্রধান যুযুৎসু— তাহাদের একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অপরটি সমূহবাদ। নেহরুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হস্তক্ষেপে ভারতবর্ষ গ্রীকায়িত হইয়া উঠিয়াছে, নেহরুর সমূহবাদের হস্তক্ষেপে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিকায়িত হইয়া উঠিয়াছে— আর তাঁহার ভারতীয় রক্তধারার হস্তক্ষেপে ভারতসত্তার একটা অস্পষ্ট আভা

চেতনার দিগন্তরে মাঝে মাঝে আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ ভারত-আবিষ্কার-ব্যর্থতারই দলিল। কলম্বস যেমন আমেরিকার নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়া তাহাকেই ভারতবর্ষ মনে করিয়াছিলেন, তেমনি নেহরুও উপ-ভারতে পৌঁছিয়া তাহাকেই ভারত মনে করিয়াছেন। এ যুগে যেসব নাবিক ভারত-আবিষ্কারে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির নাম করা যাইতে পারে। ভিন্ন পর্যায়ে হ্যাভেল, কুমারস্বামী ও নিবেদিতার নামও থাকিবে। এ দুই পর্যায়ের কোনোটিতেই নেহরুর নাম করা চলে না। সুগভীর অধ্যাত্মপ্রেরণা ব্যতীত প্রকৃত ভারতবর্ষ আবিষ্কার অসম্ভব। অধ্যাত্মপ্রেরণা নেহরুতে প্রবল নয়। ভারতবর্ষ ধর্ম বলিতে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি নেহরুর তেমন আস্থা নাই, বড়জোর কৌতূহল আছে। কৌতূহল জ্ঞানমার্গীর অবলম্বন। অধ্যাত্মসাধনার জন্য গভীরতর ও ভিন্নতর প্রেরণার আবশ্যক।

যে প্রভাবের প্রেরণা নেহরুর ব্যক্তিত্বগঠনে সবচেয়ে সক্রিয় তাহা না ভারতীয়, না আন্তর্জাতীয়; সে প্রভাব রেনেসাঁসের প্রভাব। রেনেসাঁস কোনো একটি যুগবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, সে প্রভাব এখনো পৃথিবীর ইতিহাসে সক্রিয়, তবে কালভেদে দেশভেদে অবস্থাভেদে তাহার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এ দেশের রামমোহন-চরিত্র রেনেসাঁস-প্রভাবিত, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের চরিত্র রেনেসাঁস-প্রভাবিত, নেহরু-চরিত্রও রেনেসাঁস-প্রভাবিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, তাহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয়, রেনেসাঁসের সম্ভাবনা ও পরিধি বিরাট। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, নেহরু গ্রীকায়িত ভারত-বর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছেন। এবারে তাহার তাৎপর্য বোঝা যাইবে। রেনেসাঁস-ধর্ম আর কিছুই নয়, গ্রীক জীবনবাদের পুনর্জন্ম মাত্র। পুনর্জন্মে যতটুকু প্রভেদ ঘটে, গ্রীক জীবনবাদ ও রেনেসাঁস-ধর্মে তাহার

বেশি প্রভেদ নাই। প্রাচীন গ্রীকগণ সমস্ত বস্তুতে ও বিশ্বে Principle of Beauty দেখিতে চেষ্টা করিতেন, অন্তত উক্ত Prfnciple আবিষ্কার করাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ, গ্রীকদের কাছে সুন্দর হইলেই সাত-খুন-মাপ ছিল। যেসব যুদ্ধবন্দী ইউরিপিডিসের শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিল, কোনো বিজয়ী গ্রীক রাজা তাহাদের মুক্তিদান করিয়াছিলেন। সৌন্দর্যসৃষ্টিই শিল্পের শেষ কথা কি না জানি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, শিল্পক্ষেত্রে বীভৎস ও কুৎসিত সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে। কুৎসিত বৃদ্ধের সু-অঙ্কিত ছবি দেখিয়া বলিয়া উঠিবে— সুন্দর! হাতি ও মানুষের অবয়বে মিলাইয়া গঠিত গণেশের মূর্তি সুন্দর। চীনের ড্রাগন ভীষণ, জাপানী মুখোস ভীষণ, তবু সেসব সুন্দর। সৌন্দর্যের দুটি দিক, একটিতে মুগ্ধ করে, আর একটিতে বিস্মিত করে। সৌন্দর্যের মোহকর দিকটার সন্ধানটিই গ্রীকরা পাইয়াছিল, সৌন্দর্যের সাব্লিমিটির সন্ধান তাহারা জানিত না। গ্রীক মূর্তিগুলি মোহকর, বিস্ময়ের চমক তাহারা মনে আনিয়া দেয় না। বরঞ্চ সৌন্দর্যের বিস্ময় গ্রীক ট্রাজেডিতে আছে, কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্যে তাহা অতীব বিরল। সৌন্দর্যসাধক গ্রীকদের সৌন্দর্যসাধনায় ইহা একটি আশঙ্কার রন্ধ্র। রেনেসাঁসের সঙ্গে গ্রীক আদর্শের যে প্রভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এইখানে। রেনেসাঁসের যুগ সৌন্দর্যের মোহকর ও বিস্ময়কর দুই মুখেরই সন্ধান রাখিত, কারণ মাঝখানে রহিয়াছে খৃষ্টধর্মের প্রভাব— মধ্যযুগ বলিতে যে বিরাট ও রহস্যময় ভারপরম্পরা বোঝায়, তাহার প্রভাব।

এখন, রেনেসাঁস-প্রভাবিত নেহরুর চরিত্রে সৌন্দর্যসন্ধানের প্রবৃত্তিটাই প্রবল; ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাহার চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সৌন্দর্য, এইসবই তাঁহাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছে। ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার নয়, ঐতিহাসিকের আকর্ষণ মাত্র। এমন কি, ধর্মগ্রন্থও সৌন্দর্যের আলোকে

ভাস্বর না হইয়া উঠিলে তাঁহার মনকে তেমন করিয়া নাড়া দেয় না।

"I found great difficulty in reading through many parts of them, for try as I would, I could not rouse up sufficient interest ; but sheer beauty of some passages would hold me."

ইহা সত্যান্বেষীর দৃষ্টি নয়, ইহা সৌন্দর্যান্বেষীর দৃষ্টি ; তবে গ্রীকদের মতে সৌন্দর্যই সত্য, সে হিসাবে সত্য হইতে পারে।

নেহরু অবশ্য সৌন্দর্যের বিস্ময়কর মূর্তির সহিতও পরিচিত, কাশ্মীরের সন্তানের পক্ষে এরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। ইহার জন্য তাঁহার ভারতীয় রক্ত এবং রেনেসাঁস-ধর্ম দায়ী। কিন্তু সৌন্দর্যের দীপ হাতে আবিষ্কারযাত্রায় বাহির হইয়া পড়া গ্রীক জীবনবাদের প্রেরণা ব্যতীত সম্ভব হয় না।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

আরও একটি গুরুতর বিষয়ে জওহরলাল ভারতীয় ভাবপ্রবাহকে বুঝিয়াছেন মনে হয় না। সেটিকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মানবত্ব। মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভারতবর্ষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহা যেমন মৌলিক, তেমনি গভীর। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় চিত্ত মানুষকে ও ভগবানকে এক সত্তায় মিলিত করিয়া দেখিয়াছে। মানুষই ভগবান, ভগবানই মানুষ, তত্ত্বমসি ও সোঽহম্ এই তত্ত্ব ভারতের। মানুষকে ভগবৎসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। এই ভাবধারারই পরিণামে অবতারবাদের সৃষ্টি, আর

অবতারবাদ ভারতীয়তাবাদের অন্যতম লক্ষণ। মানুষই যে ভগবান এত বড় আশা ও গৌরবের বার্তা এমন সুস্পষ্টভাবে নিঃসংশয়ভাবে আর কোন দেশে প্রচারিত হয় নাই। এই মূল কথাটি মনে না রাখিলে ভারতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে বুঝিয়া ওঠা একপ্রকার অসম্ভব। আর এই তত্ত্বের প্রভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্ম কাব্য দর্শন অন্যান্য দেশের অনুরূপ বস্তুসমূহ হইতে পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে।

গ্রীকরা অন্যান্য অনেক বিষয়ে অত্যুচ্চ ধারণায় পৌঁছিতে সমর্থ হইলেও এ বিষয়ে পিছাইয়া ছিল। তাহারা জানিত, দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আছে— কিন্তু মানুষ যে ভগবান এ বার্তা প্রচার করিবার প্রতিভা বা সাহস তাহাদের ছিল না। মানুষকে আর সব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা দেখিয়াছিল।

য়িহুদিরাও এ কথা প্রচার করিতে পারে নাই। তাহাদের জিহোবা এত উচ্চে অবস্থিত যে তাহাকে মানববৎ বলিবার কথা তাহাদের কল্পনাতীত ছিল। যীশু নিজেকে ভগবানের সন্তান, ভগবান-প্রেরিত এবং স্বয়ং ভগবান বলিয়াছিলেন, তাই য়িহুদিগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। Father, Son ও Holy Ghost -তত্ত্ব প্রকারান্তরে ভগবানের সহিত মানবের একাত্মতার বাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। পণ্ডিতেরা বলেন, যীশুর এই বাণীমূল ভারতীয় তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টান দর্শন মানব ও ভগবানের সমত্ব স্বীকার করিত। গ্রীক দর্শন ও হিব্রু দর্শন ইহা স্বীকার করিত না। ইউরোপীয় মধ্যযুগ খৃষ্টানধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে গ্রীক জীবনবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিলে গ্রীক দর্শনের পুনরভ্যুদয় ঘটিল, তখন আবার লোকের মনে খৃষ্টান দর্শনের ঐ বাণীটি সম্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল। রেনেসাঁসধর্মী ইউরোপীয় সাহিত্যে মানবের ভগবদ্‌বিচ্ছেদমূলক ভাবটাই প্রবল। মারলোর Faustus অন্তিমক্ষণে

নিজেকে যীশুর মধ্যে সমর্পণ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সেক্সপীয়রের ওথেলো অন্তিমক্ষণে আরও সুদৃঢ়রূপে নিজের অস্তিত্বের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিজত্বকেই প্রতিষ্ঠা বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে। এ দুটি দৃষ্টান্ত খৃষ্টান ধর্ম ও রেনেসাঁস-তত্ত্বের প্রতীক।

জওহরলালকে রেনেসাঁস-প্রভাবিত বলিয়াছি। জওহরলাল ভারতীয় দর্শনের সহিত অপরিচিত নন। কিন্তু পরিচয় এক আর গ্রহণ আর-এক। কতকটা স্বভাবধর্মে, কতকটা শিক্ষার গুণে রেনেসাঁস মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী। মানুষ যে ভগবান, মানুষ যে সোঽহম্, মানুষ যে তত্ত্বমসি এ বাণীর স্বীকৃতি তাঁহার গ্রন্থে কোথাও নাই, তাঁহার জীবনেও আছে বলিয়া মনে হয় না। এই মূল তত্ত্বটির স্বীকৃতি তাঁহার জীবনে না থাকিবার ফলে ভারতবর্ষকে বুঝিতে তাঁহার অসুবিধা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। মানুষের প্রতি তাঁহার আন্তরিকতার অভাব নাই, ভগবানকেও একভাবে তিনি বুঝিয়াছেন, কিন্তু এ দুই যে একই সত্তার পৃথক বিকাশ, এ কথাটা জওহরলাল বোঝেন নাই বা স্বীকার করেন নাই। এ দুই যে এক ইহা স্বীকার করিলে মানুষের ইতিহাসের মূল্য কমিয়া যায়, তার বদলে দর্শনের ও আইডিয়ার মূল্য বাড়িয়া ওঠে। এই কারণেই ভারতীয় সাহিত্যে নিছক মানুষের ইতিহাস লিখিত হয় নাই, দর্শন অর্থাৎ আইডিয়ার ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। মানুষ যে ভগবান নয়, এ কথা স্বীকার করিলে রাজনীতির মূল্য বাড়িয়া যায়, ইউরোপের স্বাভাবিক টানটা রাজনীতির দিকে। আবার মানুষ যে ভগবান এ কথা স্বীকার করিলে ধর্ম অতিশয় গুরুত্ব লাভ করে, ভারতবর্ষের টান সেই দিকে।

এখন, গান্ধীজির ও নেহরুর জীবনের তুলনামূলক সমালোচনা

করিলে প্রভেদটা কোথায় বুঝিতে পারা যাইবে। গান্ধীজি মূলতঃ ভারতীয়, নেহরু এ বিষয়ে মূলতঃ রেনেসাঁসধর্মী ; একজনের নিকট সমস্ত জীবনটাই ধর্ম, অপরের নিকটে ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম সমস্ত পৃথক। দুইয়ে এত পার্থক্য বলিয়াই গান্ধীজির সব মতকে তিনি বুঝিতে পারেন না, কিংবা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিলেও অন্তরের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন না। যেসব ভারতীয় মনীষী ও নেতা গান্ধীজির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন বা গান্ধীজির শিষ্য-সহচরে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নেহরুর সঙ্গেই গান্ধীজির মৌলিক দূরত্ব সবচেয়ে অধিক। তৎসত্ত্বেও নেহরু যে গান্ধীজিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (গান্ধীবাদকে নয়) তাহাতে নেহরুর সরলতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়, গান্ধীজির প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রকাশ পায়। এত দূরত্ব অথচ এত নিকটত্ব গুরু-শিষ্যের মধ্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

আর-একটা বিষয়ে আলোচনা করিলে নেহরুচরিত্রের তত্ত্বের দিকটা সম্পূর্ণ দেখানো হইবে। ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থের Acceptance and Negation of Life অধ্যায়ে নেহরু ভারতীয় ইতিহাসের একটি ভাবপ্রবাহের আলোচনা করিয়াছেন। Acceptance of lifeকে আমরা জীবনরতি বলিতে পারি ; Negation of lifeকে জীবনবিরতি বলিতে পারি। পণ্ডিতজি বলিতে চান যে, জীবনরতি ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান লক্ষণ। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ যখন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তখনই কেবল জীবনবিরতিকে সমর্থন করিয়াছে। বহুতর বিচিত্রতর এবং বিভিন্নতর জাতিপ্রবাহ ও ভাব-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া রূপদানের ক্ষমতাই ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ লক্ষণ। এ কথাটি রবীন্দ্রনাথ বিশদরূপে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে ও জওহরলালকে যে এক হিসাবে

ব্যক্তিত্বের সমপর্যায়ে ফেলিয়াছি তাহার কারণ, দুজনেই জীবনরতিকে তত্ত্বরূপে ও জীবনধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নেহরু ভারতবর্ষকে যে secular stateরূপে গড়িয়া তুলিতে চান তাহারও ভিত্তি জীবন-রতি-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি, কোনো সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া ভারতের স্বভাব নয়; সকলকে স্বীকার করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, ভারতীয় রূপ দান করাই এ দেশের ইতিহাসের কাজ। নেহরু যদি সেই কাজে উদ্যত হন তবে তিনি অদ্ভুত বা অপ্রত্যাশিত কিছু করিতেছেন বলা চলে না, ভারভীয় ইতিহাস-প্রবাহের অনুকূলেই চলিতেছেন বলিতে হয়; বরঞ্চ ইহার ব্যতিক্রমই অভারতীয় কাজ হইত। পাকিস্তান কখনোই secular state হইতে পারে না, কারণ ইসলাম ধর্মের প্রধান লক্ষণ জীবনবিরতি। ইসলাম ইস-লামেতর ধর্মকে স্বীকার করে না। পাকিস্তান ও secular এ দুটি শব্দ পরস্পরবিরোধী, অপর দিকে ভারতরাষ্ট্র ও secular এ দুটি পরস্পরের সমর্থক। প্রধানমন্ত্রীরূপে পররাষ্ট্রনীতিকরূপে জওহর-লালের কৃতিত্ব আলোচনার সময় এখনো আসে নাই। তবে এখন এ পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের অধ্যাত্ম-তাৎপর্য সম্পূর্ণ সুগভীররূপে তিনি বুঝিতে সক্ষম না হইলেও তাহার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তিনি বুঝিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। গান্ধীজি এ দেশের উভয় তাৎপর্যকেই বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার আদর্শ ভারতরাষ্ট্রের নাম রামরাজ্য। জওহরলাল দুটিকে বুঝিতে পারেন নাই—বর্তমান জগৎ দুটিকে বুঝিবার অনুকূলে নয়—তাই জওহরলালের প্রভাবে ও যুগধর্মের প্রবাহে অধ্যাত্মবাদ ও রাষ্ট্র পৃথক হইয়াই রহিল, কাজেই গান্ধীরাষ্ট্র বা রামরাষ্ট্র আর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তবে secular ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই সম্ভব। এ দিকে নেহরু যে পরিমাণে সক্রিয় সাহায্য করিতে পারিবেন তাহারই উপরে ভারতীয়

রাষ্ট্রনীতিকগণের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠার মান নির্ভর করিবে।

নেহরু-আবিষ্কার

এ পর্যন্ত নেহরু-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহার মূলে আছে নেহরু-রচিত আত্মচরিত ও ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থদ্বয়। আত্মচরিত পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি যে, বিদেশী প্রভাবে কিভাবে নেহরু-চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বাল্যকালে যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি ছিলেন, তাহাও বহুলাংশে বৈদেশিক ভাবাপন্ন, তার পরে বিলাতে গিয়া খাস বিলাতি প্রভাবের মধ্যে পড়িলেন, এই দুইয়ে মিলিয়া নেহরু-চরিত্র গড়িয়া তুলিল। এই প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে বলা চলে ভারতীয় উপাদানের বিদেশী রূপগ্রহ। মোটের উপরে ইহাই আত্মচরিতের মূলতত্ত্ব।

ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ বস্তুতঃ 'ভারত-প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থ, ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল ভারত-প্রত্যাবর্তন। কারণ ভারত-আবিষ্কারের সার্থকতা এই গ্রন্থে নাই, তবে নেহরু যে ভারতমুখী হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। নেহরুর জীবনে যদি গান্ধীপ্রভাব না আসিয়া পড়িত, নেহরু যদি সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে না আসিয়া পড়িতেন, তবে হয়তো কোনোকালেই নেহরু ভারতমুখী হইতেন না, ভারত আবিষ্কারের চেষ্টাও করিতেন না, ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থও লিখিত হইত না। সার্থক আইনব্যবসায়ী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, আর সেকালের সার্থক আইনব্যবসায়ীদের অনেকে যেমন 'উদারনৈতিক' রাজনীতিকে গ্রহণ করিতেন, নেহরুও হয়তো সেই পথেই চলিতেন। আত্ম-

চরিত গ্রন্থে নেহরু-চরিত্রের যে বিবর্তন দেখিয়াছি, পরিণত নেহরু-চরিত্র খুব সম্ভবত বিবর্তনের পথে তাহার অধিক অগ্রসর হইত না। ভারতীয় উপাদানে গড়া বিদেশী মূর্তি অবিকৃত থাকিয়াই যাইত। এ দেশের ইতিহাসে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সেই জনতার আবছায়া হইতে নেহরুকে বাছিয়া লইবার উপায় থাকিত না।

কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। ঘটনাপ্রবাহ অন্য খাতে বহিল। গান্ধীপ্রভাব ও অসহযোগ আন্দোলন প্রায় একই সময়ে আসিয়া নেহরু-চরিত্রের উপরে আঘাত করিল, সুনিশ্চিতের তীরভূমি হইতে নেহরু অনিশ্চয়ের বন্যাস্রোতে নামিয়া পড়িলেন, সেদিনকার সেই ভারতবাহিনী বন্যাধারা নেহরুকে বহন করিয়া ভারতাভিমুখে প্রবাহিত হইল। এই ভারতাভিমুখিতার বার্তাই ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থের উপজীব্য। নেহরু-চরিত্র-বিশ্লেষণে আমরা এই পর্যন্ত আসিয়াছি।

আর দুটি বিষয়ে আলোচনা করিলেই এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে।

প্রথমটি, নেহরু এখনো পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ বা নিজেকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। সে চেষ্টায় কতদূর তিনি সিদ্ধকাম হইবেন তাহা এখনও ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত। দ্বিতীয়টি, নেহরু-চরিত্রের সত্যকার প্রতিষ্ঠা কোথায়? মূল রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও জীবনের অন্যান্য সব প্রসঙ্গ আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

গান্ধী-চরিত্রের ভিত্তি ছিল তাঁহার অবিচলী ভগবৎনিষ্ঠা। সেইজন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষতঃ ব্যর্থ হইলেও গান্ধীজির কখনো পতন ঘটে নাই। যেসব ব্যক্তির জীবনের ভিত্তি রাজনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনো-একটা আন্দোলনে ব্যর্থ হইলেই তাহারা ধুলায় লুটাইয়া পড়ে; কিন্তু গান্ধীজির ক্ষেত্রে যে বিপরীত ঘটিত তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যত্র। একটা আন্দোলন ব্যর্থ হইলে যেখান হইতে অধিকতর

শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি পুনরাবিভূ ত হইতেন সে তাঁহার সুগভীর ও অটল ভগবৎনিষ্ঠা। নেহরু সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, তাঁহার সেইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠা আছে কি? থাকিলে তাহার স্বরূপ কি? সে ভিত্তি কি রাজনীতি, না অপর কিছু? সেই রহস্যের সন্ধানেই তো বাহির হইয়াছি, বস্তুতঃ এই আ.লাচনার নাম হওয়া উচিত নেহরু-আবিষ্কার।

নেহরুর ভারত-আবিষ্কার-প্রচেষ্টা ও তাহার আংশিক সফলতা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করিয়াছি। নেহরু ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছেন, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-পূর্ণ সৌন্দর্যময় ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু গভীরতর ভারতবর্ষ অর্থাৎ তাহার অধ্যাত্মসত্তাকে পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে এখনো সমর্থ হন নাই। তাহার জন্য চিত্তে যে অধ্যাত্মপ্রেরণার আবশ্যক, নেহরুতে তাহা ক্ষীণ। এখানে আনুষঙ্গিকভাবে আর-একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, তিনি কখনো অধ্যাত্ম-ভারতকে আবিষ্কার করিতে পারিবেন কি? তাঁহার চরিত্রে অধ্যাত্মপ্রেরণা কখনো প্রবল হইয়া উঠিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাহার সম্ভাবনা কিরূপ? ধীশক্তির প্রখরতা সত্ত্বেও নেহরু-চরিত্র ভাবাবেগপ্রধান। ভাবাবেগ দ্বারা চালিত ব্যক্তির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সহজ নহে, যেমন সহজ নহে পদ্মানদীর ভবিষ্যৎ মানচিত্রে সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয়। নেহরু যে কখনো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন না, নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু তাহার একটি অন্তরায় তাঁহার প্রখর ধীশক্তি। প্রবল ধীশক্তির ও প্রবলতর ভাবাবেগের দ্বন্দ্বে তাঁহার চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ধীশক্তির বিচারে গান্ধীবাদকে তিনি অভ্রান্ত মনে করেন না, আবার ভাবাবেগের প্রাবল্যে গান্ধীজিকে নেতা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেন; ধীশক্তির চালনায় ভারতরাষ্ট্রকে কিষাণমজদুর-রাজ রূপে গড়িয়া তুলিতে চাহেন, আবার ভাবাবেগের আতিশয্যে এ দেশের পুরাতন সমাজসংস্থাকে পরিবর্তন

করিতে তাঁহার দ্বিধা উপস্থিত হয়; ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলনের প্রস্তাব তাঁহার ধীশক্তি সমর্থন করে নাই, ভাবাবেগ তাঁহাকে ঠেলিয়া আগস্ট-আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; ধীশক্তিতে তিনি আন্তর্জাতীয়তাবাদী, ভাবাবেগে তিনি জাতীয়তাবাদের চরম। এইভাবে ধী ও ভাবাবেগের দুই কূলে প্রহত হইয়া নেহরু-চরিত্র চলিয়াছে। বয়সের আরও পরিণতি ঘটিলে হয়তো ভাবাবেগ সর্বতোভাবে তাঁহার জীবনরশ্মি ধারণ করিয়া বসিবে, তখন রাজনীতিক নেহরুর পক্ষে সন্ন্যাসী নেহরু হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে। ধীশক্তি তাঁহাতে প্রবল বলিয়াই তিনি অত্যন্ত সচেতন। যে ব্যক্তি নিজ পারিপার্শ্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন তাহার পক্ষে অধ্যাত্মপ্রেরণা লাভ ও সেই প্রেরণা অনুসারে জীবন পরিবর্তন সহজ নহে। ভাবাবেগ যদি কখনো প্রবলতর হইয়া ওঠে, তখন এই সচেতনতার প্রবাহও স্তিমিত হইয়া আসিবে, তখন অসম্ভবও সম্ভব হইবার কাল। কিন্তু সে তো আজ মহাকালের গর্ভে।

নেহরু-সমকালীনগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীও ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃতি যে কেবল পূর্ণতর তাহাই নয়—উভয় আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় কিছু প্রভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ ভারতবোধ ও বিশ্ববোধ লইয়া জন্মিয়াছিলেন। জাতিক সত্তা ও আন্তর্জাতিক সত্তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেবল সহজ নয়, সহজাতও বটে। জাতীয়তাবোধের পরিণতির সঙ্গে যে তিনি সর্বজাতীয়তাবোধে পৌঁছিয়াছেন—এ কথা সত্য নহে।

গান্ধীজি আন্তর্জাতিক শব্দটি বড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার বাস্তব-ঘেঁষা বুদ্ধি নির্গুণ শব্দ পছন্দ করিত না। আন্তর্জাতিক শব্দটির তুলনায় মানুষ শব্দটি অনেক বেশি সগুণ, গান্ধীজি মানুষ শব্দটিকেই আন্তর্জাতিক অর্থে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানুষের

পক্ষে যাহা সত্য, সর্বজাতির পক্ষে তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। মানব-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত, এই সন্ধানে বাহির হইয়া তিনি আদর্শ মানবকে আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহাতেই ভারতবর্ষ ও বিশ্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।

নেহরু অন্য প্রক্রিয়ায় ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারত-আবিষ্কারের আগে তিনি বিশ্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, 'দি ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া'র আগে 'দি গ্লিম্‌প্‌সেস্‌ অব্‌ ওয়ার্‌ল্‌ড্‌ হিস্ট্‌রি'র রচনা। সেই বৃহত্তর আবিষ্কারের সূত্র অনুসরণ করিয়া তিনি ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। সমস্ত অরণ্য পরিক্রমণ করিয়া বিহঙ্গ আপনার কুলায়বৃক্ষে আসিয়া উপনীত। কুলায়বৃক্ষ বটে, কিন্তু ঠিক কুলায়টি নয়। সেই কুলায়টি দেশের অধ্যাত্ম-সত্তা, যেখানে মানুষের সত্যকার আশ্রয়। সেই পরম আশ্রয়টুকু নেহরুকে এখনো আবিষ্কার করিতে হইবে, তবেই নেহরু-চরিত্র-তোরণের শীর্ষদেশে শেষ প্রস্তরখণ্ডটি সুবিন্যস্ত হইবার সম্ভাবনা।

যাহা এখনো সম্ভাবনা তাহা সম্ভাব্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নেহরু সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসা যাইতে পারে। নেহরু-চরিত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি ?

নেহরুর যথার্থ প্রতিষ্ঠা তাঁহার ব্যক্তিত্ব। তাঁহার অসাধারণ মনীষা, তীব্র ভাবাবেগ, সুদৃঢ় চরিত্র, সমস্তই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক। যে শক্তির প্রভাবে তিনি দেশবিদেশের লোককে মুগ্ধ করেন, যে শক্তির আকর্ষণে তাঁহার নামে সভাস্থলে দশ লক্ষ লোক সমবেত হয়, সে শক্তি তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে উপজাত। চরিত্রশক্তিতে খুব সম্ভব প্যাটেল সমৃদ্ধতর, খুব সম্ভব রাজনৈতিক মনীষা রাজাগোপালাচারির অধিক, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল অল্প লোকেরই আয়ত্ত। চরিত্রশক্তি দিবা-লোকের মত, কাজ চালাইবার পক্ষে তাহাই সবচেয়ে প্রশস্ত ; ব্যক্তিত্বের

শক্তি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত, কাজ চালাইবার জন্য তাহা উপযোগী না হইলেও মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অনেক বেশি, আর অন্ধকারে পথ দেখাইবার দিশারী ব্যক্তিত্ব, প্রতিভাপ্রেরিত চঞ্চল রশ্মিশিখা। ব্যক্তিত্বে নেহরুর কেবল প্রতিষ্ঠা নয়, তাঁহার প্রতিভার উৎসও ঐখানে।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বস্তুদুটির পরিচয় জানিয়া লওয়া উচিত। সংসারে চরিত্রবান লোকের অভাব নাই, ব্যক্তিত্ব অতিশয় বিরল। চরিত্রবান হইলেই যে ব্যক্তিত্ববান হইবে, এমন নয়। আবার ব্যক্তিত্ববান হইলেই যে চরিত্রবান হইবে, এমনও নয়। দুইয়ে অবশ্য যোগ আছে, কিন্তু আবশ্যিক যোগাযোগ নাই। কঠিন চরিত্র কঠিন পাথরের খণ্ড, ব্যক্তিত্ব হীরক-প্রস্তরের দীপ্তি। হীরাও পাথর, কিন্তু সব পাথর দীপ্তিমান নয়। ভারের দিকটায় সাধারণ পাথর ও হীরক পাথর সমান, কিন্তু দীপ্তির দিকে সমান নয়। হীরকখণ্ড তাহার ভার মনে করাইয়া দেয় না, দীপ্তির ধার মনে করাইয়া দেয়, দীপ্তির মূল্যেই তাহার আদর। নেহরুর চরিত্র হীরার ভার, কিন্তু তাঁহার আসল মূল্য ব্যক্তিত্বের প্রভায়। সংসারে সাধারণত যেসব চরিত্রবান লোক দেখিতে পাই তাহারা সাধারণ প্রস্তর-খণ্ড, তাহারা নির্বাপিত, ব্যক্তিত্বের জ্যোতি তাহাদের নাই। নেহরু ব্যক্তিত্বের আভায় জ্যোতিষ্মান্। এ কথা সবাই জানে যে, নেহরুর বিশেষ কোনো দল নাই, ব্যক্তিত্বমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভারত-রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোনোদিন দলাদলির টানাটানিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা-ভ্রষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব, কিন্তু সে সময়েও নেহরুর প্রভাব কমিবে না, বরঞ্চ রাজনীতির আবহাওয়া হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব অধিকতর জ্যোতির্ময়রূপে প্রভাসিত হইতে থাকিবে। চরিত্রকে বুঝিতে শক্তি লাগে, ব্যক্তিত্ব স্বতোদ্‌বুদ্ধ। হাতে না লইলে পাথরের ভার বোঝা যায় না, হীরার দীপ্তি দূর হইতেও প্রত্যক্ষ। বিদ্যাসাগর সুমহৎ চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে

বুঝিতে দেশের সময় লাগিয়াছিল। অপরিচিত বিবেকানন্দকে দেখিবা-মাত্র যে আমেরিকার লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, সে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্যোতির কারণে। নেহরুকেও ঠিক ঐ কারণেই এবারে আমেরিকার লোকের বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই।

নেহরুর অনুরূপ কোথায়? নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর কোথাও তাঁহার অনুরূপ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার যথার্থ অনুরূপ আছে কবির কল্পনাজগতে। ইতিপূর্বে কোনো কোনো স্থানে আমি নেহরুকে প্রিন্স হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি, আর-একবার সেই তুলনার জের টানিয়া চলিতে চাই। হ্যাম্‌লেটের প্রতিভা ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বে। ঐ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তিনি ডেন্‌মার্কের সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। সিংহাসনচ্যুত হইয়াও তাহার প্রভাব কমে নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিলেও তাহার প্রভাব বাড়িত না। নিজের ব্যক্তিত্বের সিংহাসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

হ্যাম্‌লেটে ও নেহরুতে আরও এক বিষয়ে মিল আছে। ভাবলোকের লোক হ্যাম্‌লেট কর্মলোকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, নেহরু সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য নয় কি? অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর সময় জন্মিলে নেহরু বই লিখিয়া (কবিতা লেখাও অসম্ভব হইত না) আপন ভাবসূত্রের রোমন্থন করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিতেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্বল্পবিকশিত হইয়াই আপন লীলা সম্বরণ করিত। হ্যাম্‌লেট সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য নয় কি? কিন্তু তাহা হইবার নয়; দুজনেই ইতিহাসের উদ্‌ঘাতিনী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দুজনেই ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎশিখায় পথ দেখিয়া চলিতেছেন, দুজনেই দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন। হ্যাম্‌লেট সুখী নয়, ভাবলোক ও কর্মলোকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে না পারিয়া আর্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন—

The time is out of joint : O cursed spite,
That ever I was born to set it right !

নেহরুর জীবনেও ভাব ও কর্মের দ্বন্দ্ব বিরাজমান। তাঁহার আত্মচরিত ও ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থের পাঠক মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইবেন। রাজনীতি তাঁহার স্বধর্ম নন, কাশ্মীরের হিমশৃঙ্গ তাঁহার স্বাশ্রয়। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া পলায়ন করিতে তাঁহার মনে ইচ্ছা জাগিতেছে—এমন উক্তি ভাষান্তরে তাঁহার গ্রন্থে বিরল নয়। কিন্তু উপায় নাই, কারণ that ever he was born to set it right। হ্যাম্‌লেটের মতো নেহরুও সুখী নন। হ্যাম্‌লেটের চেয়েও তাঁহার দুর্ভাগ্য বেশি। হ্যাম্‌লেটের হোরেশিও ছিল, নেহরু নির্বান্ধব, কমলা গত।

দুই জীবন

ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থে 'দুই জীবন' নামে ছোট একটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়টিতে নেহরু তাঁহার ভাবজীবনের ও কর্মজীবনের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কর্মীরূপে যেসব কর্মে তিনি যোগদান করেন, যেসব আন্দোলনের তিনি উদ্‌বোধন করেন, মাঝে মাঝে সেসব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নির্লিপ্তভাবে তাহাদের লক্ষ্য করেন। তখন একপ্রকার বৈরাগ্য ও ব্যর্থতা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসে, তখন নিজের কর্মীসত্তাকে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে হয়, মনে হয় এ সমস্তর সত্যকার সার্থকতা কোথায় ? কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হয় না, ভাবুককে আবার কর্মের স্তরে নামিয়া আসিয়া

ঘটনাপ্রবাহের বল্‌গা ধারণ করিতে হয়। কর্মীশ্রেষ্ঠ পার্থও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে একবারের জন্য এইরূপ ব্যর্থতার ভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

এখন নেহরুর পক্ষে মুশকিল এই যে, তাঁহার জীবনের মধ্যে যোগাযোগের পথ কোনো কালেই প্রশস্ত ছিল না। তবু যতদিন কমলা জীবিত ছিলেন নেহরুর দুই সত্তার মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। কমলা গত হইলে সে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গেল, নেহরুর দুই জীবন-কোটি জীবনধনুকের দুই কোটির মতো দূরে সরিয়া গেল, জ্যা-রূপিণী জায়া অন্তর্হিত হওয়ায় ইহাদের যুক্ত করিবার উপায় রহিল না। কর্মী নেহরুর ইতিহাস তাঁহার কর্মে প্রত্যক্ষ, সাধারণে তাহার পরিচয় জানে। ভাবুক নেহরুর চিন্তার কল্পনার জল্পনার পরিচয়ও তাঁহার গ্রন্থে ও বক্তৃতায় বিদ্যমান, কিন্তু সেসব তেমন প্রত্যক্ষ নহে। সেই পরিচয় এখন দিতে যাইতেছি। কর্মের সহিত মিলাইয়া তাহাদের গ্রহণ করিলে নেহরুর পরিচয় পূর্ণতর হইবে সত্য, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য নেহরুর যথার্থ পরিচয় দান। আমার বিশ্বাস, যেহেতু ভাবুক নেহরুই মহত্তর, এইসব ভাবনাতেই নেহরুর মহত্তর ও যথার্থতর পরিচয় বিরাজিত। সেই উদ্দেশ্যেই এবারে কবি নেহরুর, ভাবুক নেহরুর স্ববর্ণিত পরিচয় বিশ্লেষণ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

অন্তর্লোক ও বহির্লোকের যে দ্বন্দ্ব নেহরুর চরিত্রে দেখিতে পাই তাহার কারণ একাধিক। যে নিছক কর্মী, কর্মেই তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকাশ; যে নিছক ভাবুক, ভাবেই তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকাশ; কিন্তু যে একাধারে ভাবুক ও কর্মী তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য ভাবলোক ও কর্মলোক দুয়েরই প্রয়োজন হয়। নেহরুর 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, নেহরুর ব্যক্তিত্ব যেসব তন্তুতে গঠিত, সাধারণ রাজনীতিকগণের জীবনতন্তুর ন্যায় সেসব

তেমন শক্ত নয়, অসাড় নয়। নেহরুর জীবনতন্তু স্পর্শকাতর, সূক্ষ্ম, কোমল ভাবগ্রাহী; সেসব অল্পেই সাড়া দিয়া ওঠে, তাহার রণন অনুরণন একবার উঠিলে আর থামিতে চায় না। এখন, এরকম উপাদানে গঠিত চিত্ত রাজনৈতিক মল্লক্ষেত্রের উপযোগী নয়। চরিত্রের উপাদানে তাঁহার দার্ঢ্য আছে বলিয়া তিনি রাজনীতিকে সহ্য করিতে পারেন, আবার ব্যক্তিত্বের উপাদানে স্পর্শকাতরতা আছে বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে বিরাম লইতে হয়। নেহরুর এই বিরামলোক তাঁহার ভাবলোক। তাঁহার ভাবলোক বিশ্লেষণ করিলে দুটি উপাদান পাওয়া যাইবে, প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক অতীত কাল। প্রকৃতির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ আর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অতীতের প্রতি সুগভীর অনুরাগ— নেহরু-ব্যক্তিত্বের দুটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। ইহাদের স্বরূপ ও ইহাদের প্রতি নেহরুর আকর্ষণের স্বরূপ না জানা অবধি তাঁহাকে পুরা বুঝিতে পারা যাইবে না।

প্রকৃতি ও অতীতকাল দুইই বাস্তব জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে নেহরুর যখন দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তখন তিনি এ দুয়ের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়া থাকেন। নেহরুর চলনে বলনে, আবেগ-অধীর বাগ্মিতায়, মন্থর ঘটনার ঘাড় ধরিয়া অগ্রসর করিয়া দেওয়ায় সর্বত্র একটা চঞ্চলতা ও ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যায়। এই চঞ্চলতা ও ব্যস্ততার কারণ কি? নেহরু মনে মনে বাস্তব হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। পাহাড়ে শহর চুংকিং-এর সোপানাবলী দ্রুত উত্তরণ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া যায় যে, বয়স পঞ্চাশের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নেহরুর দ্রুত পদক্ষেপ তাঁহার বয়সকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। বয়স যে বাস্তবের চিহ্ন। এখানে গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। গান্ধী বাস্তবের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তিনি বাস্তবের প্রভু। আর নেহরু

বাস্তব পাঠশালার পলাতক ছাত্র। চিরপলাতক হইবার ইচ্ছা নাই— বাস্তবের আকর্ষণও বড় সামান্য নয়— কেবল একবেলাকার পলাতক। বাস্তবের গুরুমহাশয়ের ক্ষণিক অনবধানতার সুযোগে চিরবালক নেহরু পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ান, সেখান হইতে দেখা যায় হিমালয়ের দিগন্তে অতিদূর গিরিরেখার বিচিত্র ওঠা-পড়া, সেখান হইতে দেখা যায় ইতিহাসের দিগন্তে খাইবার-গিরিবর্ত্মের গোমুখী কন্দর-নিঃসৃত অনাদিকালের জীবন-জাহ্নবীপ্রবাহ।

"পর্বতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম,··· প্রকাশমান পর্বতদৃশ্য মনে উল্লাসের ভাব আনিয়া দিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতেছি, খাদ গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে; শৃঙ্গরাজি মেঘলোকে বিলীয়মান হইয়া দণ্ডায়মান। আমি তৃষিতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম; যখন এইসব দৃশ্য হইতে দূরে গিয়া পড়িব তখন যাহাতে ইহাদের স্মরণ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলাম।··· যাত্রাপথের শেষে আসিয়া পৌঁছিতে সহসা মেঘমালা অপসৃত হইল, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বিস্ময়ের চমক বহন করিয়া আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইল। অরণ্যভূষিত গিরিমালার ঊর্ধ্বে, বহু দূরে হিমালয়ের তুষার-শিখরশ্রেণী রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। পুরাণী প্রজ্ঞার বাহন, ভারতের সমতল ভূমির প্রহরী, শান্ত ও রহস্যময় ঐসব পর্বতশৃঙ্গ। তাহাদের দেখিয়া মস্তিষ্কের চিন্তাজ্বর অপগত হইল, তাহাদের চিরন্তনতার প্রভাবে নাগরিক জীবনের ক্ষমতালোলুপতা, মিথ্যা এবং অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

নেহরুর কাছে হিমালয় কেবল চিত্তবিশ্রাম নয়, ভারতের চিরন্তন প্রতীক। চিন্তাজ্বরের প্রকোপে রক্ত-অধীর ধমনীর কম্পিত শিয়রে

হিমালয় তাহার শান্ত সমাহিত প্রজ্ঞার সঞ্চয় ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ভারতের যে সনাতন রূপ রাজনীতিকের চোখ এড়াইয়া যায়, নেহরুর চোখে তাই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভারতের সনাতনী বাণীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে বহন করিয়া আনা সহজ নয়; নেহরু কতদূর কৃতকার্য হইবেন তাহার আলোচনার স্থান এখানে নয়, কিন্তু এ কথা সত্য যে সে বাণীর সন্ধান নেহরু পাইয়াছেন। সে বাণীর রহস্যময় ভাষার পাঠোদ্ধার হয়তো এখনো তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু একটা যে কিছু আছে অন্ততঃ এ সত্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত নয়।

"তেইশ বৎসর পরে গত মাসে আমি কাশ্মীর গিয়াছিলাম। কেবল বারোটি দিন সেখানে ছিলাম বটে, কিন্তু দিনগুলি সুধায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সৌন্দর্যের জাদুপাত্র ভরিয়া আমি পান করিয়াছিলাম। উপত্যকায় এবং উচ্চতর শৃঙ্গের হিমানীপ্রবাহে আমি আরোহণ করিলাম, জীবন অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইল।"

'জীবন অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইল।' ভারতের সন্তান ব্যতীত আর কাহারও কাছে হিমালয় তাহার জীবনবেদ এমন করিয়া খুলিয়া ধরে না।

"জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি আসিল, বাতাসে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। বুলবুল ও অন্যান্য পাখির গান আবার শোনা গেল, ছোট ছোট অঙ্কুর মাটি ভেদ করিয়া রহস্যের বার্তা বহন করিয়া দেখা দিতে লাগিল।"

এখানে নেহরু বিশুদ্ধ কবি, নিছক ভাবুক; ভারতমূর্তির অতীতলোকে যেখানে মানব ও প্রকৃতির জীবনধারা মুক্তবেণী হইয়া গিয়াছে, বসন্তের প্রথম আগমনীর হাতছানিতে তিনি একেবারে সেই আদিম তীর্থে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রাচীন ইতিহাসকেও এইরূপ বিবিক্তভাবে দেখিবার চিহ্ন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান।

নেহরু বলিতেছেন যে, ভারতের বর্তমান দুর্দশা দেখিয়া বিদেশী সমালোচকগণ যেমন একপ্রকার বিরূপ মনোভাব লইয়া ভারত দর্শন করিতে আসে— তাঁহার অবস্থাও প্রথমে প্রায় সেই রকম ছিল। কিন্তু সে অবস্থা বেশিকাল থাকিল না, অতীত গৌরবের পটে ভারতের বর্তমানকে তিনি দেখিতে সমর্থ হইলেন, তখন সমালোচনার বদলে আসিল প্রেম, কৌতূহলের বদলে আসিল শ্রদ্ধা, তাঁহার অঙ্গ হইতে কখন বিদেশী পোশাক খসিয়া পড়িল, ভারতের লক্ষযোজন বিস্তৃত ইতিহাসের গৈরিক কখন তিনি ধারণ করিলেন।

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপের উপরে দণ্ডায়মান নেহরুর চোখে কি অনাদ্যন্ত জীবনলীলা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল!

পাঁচ হাজার বৎসরের এবং তাহারও অধিক কালের এ কি অখণ্ড ঐতিহ্যপ্রবাহ! কেমন করিয়া এই অখণ্ডতা রক্ষিত হইল, কেমন করিয়া সকল পরিবর্তন সত্ত্বেও মূলপ্রবাহ গতিশীল হইয়া রহিল— এ চিন্তা নেহরুকে পাইয়া বসিল!

"যেসমস্ত মহান তীর্থযাত্রী চীন হইতে, পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়া হইতে প্রাচীনকালে এ দেশে আসিয়াছে, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহচর্যে আমি ভারতযাত্রা শুরু করিলাম।··· হিমালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যে হিমালয় পুরাণ ও পুরাতনী কথার সহিত ওতঃপ্রোত, যেসব কাহিনী আমাদের সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে এমন প্রভাবিত করিয়াছে।"

তার পরে তিনি ইতিহাসের মূর্তপ্রবাহস্বরূপ সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদের স্মৃতিসৌন্দর্যের কথা বলিয়াছেন, এবং অবশেষে গঙ্গা।

"অবশেষে গঙ্গা, ভারতের অন্যান্য সমস্ত নদনদীর চেয়ে

গভীরতরভাবে ভারতের হৃদয়কে জয় করিয়াছে, ইতিহাসের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে অগণিত নরনারীকে তাহার তীরে আকর্ষণ করিয়াছে! গঙ্গার কাহিনী গোমুখী হইতে সাগরসংগম অবধি, প্রাচীন কাল হইতে অর্বাচীন কাল অবধি, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী, সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের কাহিনী, মহতী নগরীসমূহের কাহিনী, ভারতীয় ঋষিগণের অধ্যাত্মলোকে যাত্রার কাহিনী, ঐশ্বর্যের বৈরাগ্যের পতন-অভ্যুদয়ের, জরা ও জীবনের, জন্ম ও মৃত্যুর কাহিনী সমস্তই গঙ্গার কাহিনী।"

কিন্তু এইসব মানসযাত্রাই নেহরুর একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। ইহার পরিপূরকভাবে আছে বাস্তব যাত্রা—অজন্তা এলোরা এলিফেণ্টা, আগ্রা দিল্লি এবং কুম্ভমেলা। মানসে ও বাস্তবে মিলিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের মূর্তি তাঁহার চোখে পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

"পাঁচ হাজার বছরের পটভূমি আমাকে নূতন দৃষ্টি দান করিল, বর্তমানের ভার সুসহ হইয়া আসিল। ১৮০ বছরের বৃটিশ শাসনকে অন্যতম দুঃসহ অঙ্কমাত্র মনে হইল; মনে হইল, ভারত আবার আত্মদর্শন করিবে, পুরাতন অধ্যায়ের শেষতম পত্র ইতিমধ্যেই নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

নেহরুর মানসভ্রমণকে বাস্তববিমুখতা মনে করিলে চলিবে না। বাস্তবকে বুঝিবার উদ্দেশ্যেই ইহা বাস্তবকে দূরে রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা, অনেক ছবিকে যেমন খানিকটা দূরে রাখিয়া তবে বুঝিতে হয় সেই রকম। ইহা অতীতের ভাষ্যের সাহায্যে বর্তমানকে বুঝিবার প্রয়াস। কিম্বা নেহরুর কাছে ভারতের অতীতকাল এমন সজীব এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহা একপ্রকার বাস্তবের গুণ পাইয়া বসিয়াছে। নেহরু বলিতেছেন, "ক্ষণকালের জন্য আমি অতীতের অধিবাসী হইয়া পড়িতাম, বোধিসত্ত্ব ও অজন্তা-চিত্রাবলীর সুন্দরী রমণীরা

আমার কল্পনা অধিকার করিয়া বসিত। কিছুদিন পরে মাঠে কাজ করিতেছে এমন কোনো নারীকে দেখিয়া কিংবা গ্রামের কুয়া হইতে জল তুলিতেছে, এমন কোনো নারীকে দেখিয়া হঠাৎ আমি চমকিয়া উঠি, সে আমাকে অজন্তার নারীদের স্মরণ করাইয়া দেয়।"

এমন লোকের কাছে কি বাস্তবে ও কল্পনায় ভেদ আছে? এমন লোকের কাছে কি দুইয়ে এক হইয়া যায় নাই? এমন লোকের সম্বন্ধে কি বাস্তব-বিমুখতার প্রশ্ন আদৌ ওঠে? যেখানে দুইয়ে ভেদ আছে, সেখানে ঐ সমস্যা; কিন্তু যেখানে দুইয়ে মিলিয়া এক সেখানে?

কোনো টাইম-মেশিনের দৌত্যে নেহরু হঠাৎ যদি অশোকের আসনে গিয়া পড়েন তবে তিনি নিজেকে আদৌ কালচ্যুত মনে করিবেন না; মহেঞ্জোদারোর আমলেও তিনি নিজেকে স্বকালবর্তী বলিয়া মনে করিবেন। নূতন দিল্লির ছক-কাটা পথাবলীতে যে নূতন দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন চলিতেছে, সেখানে কি নেহরু নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করেন? বাগ্মিতার রথচক্র-আলোড়নে বর্তমানের উড্ডীয়মান ধূলিতে পরিষদকক্ষের নিশ্বাস যখন বন্ধপ্রায় হইয়া আসে তখন কি হিমালয়ের তুষারদর্শন-প্রত্যাশায় নেহরু হঠাৎ বাতায়নের দিকে তাকান না? চারিদিকে যেসব মূর্তি দৃষ্ট হয় তাহাদের তো বোধিসত্ত্ব বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ নাই। পরিষদ-কক্ষেও অবশ্য নারী আছে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে অজন্তার নারী-সমাজের মিল কোথায়? কোথায় সেই প্রান্তরচারিণী নারী? কোথায় সেই কূপোদকবাহিনী?

দেশের বর্তমানকে অতীতের পটে রাখিয়া দেখিবার ক্ষমতা নেহরুর আছে। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি নিজের অতীতকে নিস্পৃহভাবে দেখিতে সক্ষম, যেন তাহা

অপরের অতীত, অন্যের জীবনকাহিনী! নেহরু তাঁহার 'আত্মচরিত' সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বইখানা যখন পড়ি, মনে হয় যেন আর কেহ পুরাতন দিনের এক কাহিনী লিখিয়াছে। বিগত পাঁচ বছরে পৃথিবীর কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার ছাপ আমার মনে পড়িয়াছে। আমার জীবন জনতা ও নির্জনতা, কর্ম ও নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে বিভক্ত।"

কারাজীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার জীবনের কত গতকল্য এখানে সমাহিত। এক-এক সময়ে সেইসব মৃত দিনগুলি বিষদিগ্ধ স্মৃতি বহন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে শুধায়—এসবের সার্থকতা কোথায়?"

এইসব নিভৃত চিন্তার নেহরু কি রাজনীতিক? কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে— তিনি স্বভাবত কবি নন, ভাবুক নন, ভাবাবেগের বৈরাগী নন? বিধাতা এমনভাবে রাজনীতিককে হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, জগৎচিন্তা ও আত্মচিন্তার চতুষ্পথের মোড়ে দাঁড় করাইয়া দেন না। সৌভাগ্যবান সেই রাজনীতিক, যাহার মনঃসরণী একাগ্র।

মানুষের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এক-একজন লোক দেখা যায় যাহাদের প্রধান পরিচয় কর্মে নয়, রচনায় নয়, লোকনায়কত্বে নয়; নিছক ব্যক্তিত্বের গৌরবে তাহারা গরীয়ান, ব্যক্তিত্বের পরিচয়েই তাহাদের প্রধান পরিচয়। তাহারা যেন বিধাতার রচিত কাব্য। দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান কিছুই স্বয়ম্পূর্ণ নয়— রচনার বাহিরে তাহাদের পূর্ণতা, তাহাদের সার্থকতা। কিন্তু কাব্যের বিচার সে-ভাবে চলে না। কাব্যেই কাব্যের শেষ। ব্যক্তিত্বগৌরবী ব্যক্তিরা বিধাতার কাব্য, নেহরু-ব্যক্তিত্ব এইরকম একখানি কাব্য। নেহরু-জিজ্ঞাসুকে নেহরু-ব্যক্তিত্বে সার্থকতা সন্ধান করিতে হইবে; নেহরুর কর্মে, নেহরুর লোকনায়কত্বে তাহার সন্ধান করিলে চলিবে না। এই কারণেই পরবর্তী কালের কবি ও শিল্পীগণের পক্ষেই নেহরুকে

উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা অধিক। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক লেখককে তিনি তেমন করিয়া আকর্ষণ করিবেন না। একালের লোকনায়কগণের মধ্যে গান্ধী ও নেহরুকে লইয়া পরবর্তীকালের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ যেমন মাতিবে, এমন আর কাহাকেও লইয়া নয়। নদীর পলিতে নদীস্রোতের যেটুকু পরিচয় পড়িয়া থাকে নেহরুর কর্মে তাহার চেয়ে বেশি পরিচয় অবশিষ্ট থাকিবে না। নেহরুকে জানিতে হইলে তাঁহার কর্মকে জানিলে চলিবে না, তাঁহার লোক-পরিচালনা জানিলে চলিবে না; নেহরুকে জানিতে হইলে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে জানিতে হইবে। কারণ কাব্যের মতোই নেহরুতেই নেহরুর শেষ।

নেহরুর সম্মুখে তাঁহার জীবননাট্যের পঞ্চমাঙ্ক। পঞ্চমাঙ্কের সাফল্যের উপরেই সমগ্র নাটকখানির নির্ভর। জীবননাট্যের বিধাতা কোন্ নিভৃত নেপথ্যে বসিয়া কি উপাদান সঞ্চয় করিতেছেন কে জানে? নেহরুকে কি তিনি রাজনীতি হইতে টানিয়া লইবেন? দলের আশ্রয় কি তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? আরও কত কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে। সম্ভাবনা যাহাই থাকুক, এ কথা নিশ্চিত যে, যিনি চারটি অঙ্ক ধরিয়া একটি জীবননাটককে এমন সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, পঞ্চমাঙ্কের চরম সাফল্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না। তিনি সযত্নে রচিত বেদনার আগ্নেয় কিরীট স্বহস্তে তাঁহার শিরে অর্পণ করিবেন। জীবনবিধাতার অভিষেকে মহত্তর নেহরু মূর্তিলাভ করিয়া ব্যক্তিত্বের চিত্রশালিকায় চিরকালের আসন লাভ করিবেন।

যুগে যুগে রাজপুত বীরকুমারীগণ জহরব্রতের উদ্দীপ্তবহ্নির কিংশুককোমল শিখার সম্মুখে যে মূর্তি ধ্যান করিয়া, যে-আকাঙ্ক্ষা আকাশে বাতাসে নিশ্বসিত করিয়া, মরীচিকা-কম্পিত দিগন্তরে

উদ্ধারকারী রাজপুত বীরের চলমান অশ্ববাহিনীর আশায় শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তরুণ তনুমঞ্জরী পাবকের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান ও ভরসা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইয়াছিল।

পাটলিপুত্রের প্রাসাদবলভিতে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি প্রস্ফারিতনেত্রে সংগ্রহ করিয়া লইয়া বীরত্বগাথা পাঠনিরতা রাজকন্যার একাগ্র ঔৎসুক্য, উজ্জয়িনীর বিলাসবিভ্রম-নিপুণার দুঃসহ বিরহ-আর্তি, ভূপতিত কেশকলাপ দর্শনে সদ্যমুণ্ডিতা ভিক্ষুণীর বেদনাময় আনন্দের মিশ্র অনুভূতি, এ সমস্তই ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত হইয়াছিল। দেশের সমস্ত ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কবির স্বপ্ন, বীরের বীর্য, ঋষির তত্ত্বচিন্তা, যোগীর সাধনা, সমস্ত ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ভারতের চিত্তস্ফটিকের মাধ্যমে সংগৃহীত হইয়া, একীভূত হইয়া একটি ব্যক্তিত্বশিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। নেহরু সেই ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিক নেহরুর ঊর্ধ্বে ব্যক্তি নেহরু, আর ব্যক্তি নেহরুর অনেক ঊর্ধ্বে নেহরুর ব্যক্তিত্ব।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষ্যে লিখিত।
'দেশ'পত্রে (৩ অগ্রহায়ণ—৯ পৌষ ১৩৫৬) প্রথম প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

চিত্রাবলী : স্বীকৃতি

অগ্রপৃষ্ঠে জওহরলাল। প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো, নিউদিল্লি

রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল। শ্রীতারক দাস, অমৃতবাজার পত্রিকা

গান্ধী ও জওহরলাল, ও মলাটের চিত্র। শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

মূল্য আড়াই টাকা